রাজা
রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায়

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

রাম!—রাম! ভারতের কোটি কোটি মানুষের নিকট 'রাম' শব্দটি অতিশয় পবিত্র। রাম তাঁদের জীবনের পরমতম মিত্র।—রাম নাম পবিত্র করে তাঁদের চিত্ত।

রামের নাম দিয়ে ভারত রচনা করেছে রামায়ণ। সেই রামায়ণ অতুলন।

সেই সেকালের রাম এর পরেই, আসছেন একালের রাম—রামমোহন—ভারতমোহন, বিশ্বমোহন রামমোহন।

রামমোহন মোহনই বটে! 'মোহন' শব্দটি কতই মোহন! পলাশীর রণক্ষেত্রে—মোহনলাল। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ক্ষেত্র—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ভারতের ক্ষেত্রে-ক্ষেত্রে—শত ক্ষেত্রে—রামমোহন। ধর্ম চাও? রামমোহনের নিকট যাও। রাজনীতি চাও? রামমোহনের নিকট যাও! রামমোহনের শরণ নাও! শিক্ষা চাও? রামমোহনের নিকট দীক্ষা নাও। চাও তুমি যাহা যাহা, রামমোহনের নিকট মিলবে তাহা। ভারত-ভূমির শীর্ষপার্শ্বে সুমহান শুভ্র হিমালয়। ভারত-জীবনের শীর্ষপার্শ্বে মোহন রামমোহন জ্যোতির্ময়।

রামমোহনের জীবনী যেন এক বিশ্ব-কাহিনী!—এ উক্তি যে অত্যুক্তি নয়, তাঁর জীবন-কাহিনী থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

যেরূপ একটি মাত্র কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাও মানুষ এই পৃথিবীতে যশ লাভ করে, রাজা রামমোহন রায় সেইরূপ বহু কর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

রামমোহন ধর্মপ্রচারক, ধর্মসংস্থাপক, শিক্ষা প্রচারক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগঠক, শিক্ষাবিস্তারে অর্থদাতা, বহু ভাষাবিদ, বহু শাস্ত্রবিদ, একাধিক ভাষায় একাধিক রচনা প্রণেতা, গদ্যসাহিত্য প্রণেতা, সাহিত্য প্রচারক, ব্যাকরণকার, সমাজ-সংস্কারক, গীত-

রচয়িতা, কবি, সুগায়ক, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে মিত্রতা-সংস্থাপক রাজদূত, বাগ্মী, পত্রিকা সম্পাদক, পত্রিকা প্রচারক, শাস্ত্রীয় বিচারদক্ষ, গ্রন্থকার, দুঃসাহসী পর্যটক, ভোজনপটু, সুবৃহৎ মস্তক-বিশিষ্ট দীর্ঘকায় সুশ্রী, বলিষ্ঠ মানব।

আবির্ভাব-কাল ঃ রামমোহনের আবির্ভাব-কালে ভারত ভাতিময় নয়, ভারত ভাতিহীন। ভারতের সেই যুগ ভারতের আর্য যুগ নয়, মৌর্য যুগ নয়—শৌর্য যুগ নয়। ভারতের তখন দাস্য,—হাস্য তার নেই।

ভারত-শোষক বিদেশী তখন শাসক বেশে ভারতকে ভাতে মারছে, আঁতে মারছে।

যথার্থ ধর্ম তখন ভারতের মর্মে নেই, কর্মে নেই। ধর্মযজ্ঞ নেই, কর্মযজ্ঞ নেই! আছে শুধু স্কন্ধে লম্বমান যজ্ঞসূত্র। সদাচারের নামে তখন চলছে কদাচার।

রাজনীতিক্ষেত্রে বহু ভারতীয়ই তখন বিদেশী রাজের কৃপারজ আহরণে তৎপর। তরবারই যে তরবার পথ—স্বাধীনতার পথ—সে চিন্তা চিত্তদেশে জাগ্রত হচ্ছে না।

দেশের মধ্যে লেখা-পড়ার অবস্থা তখন কি রকম?

লেখা-পড়া তখন মরা বা আধমরা। পুঁথি লোকে চায় না, পুঁথি লোকে পায় না। চায় পুঁতির মালা। মনে করে, তাহাতেই জীবন হয় আলা।

বেদচর্চার আমোদ তখন লোকের মধ্যে নেই। মহত্ত্ব লাভের জন্য মত্ততা তখন নেই। বুলবুল পাখীর লড়াই দেখা, তাস খেলা, পাশা খেলার আনন্দে লোকে নৃত্য করে ধেই ধেই করে।

তখন, নারীরা দেবদেবীর কৃপা প্রাপ্তির কামনায় জীবন্ত পুত্রকে গঙ্গাসাগরে ভাসাতেন ও ডোবাতেন। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, তাঁরাও জীবন্ত অবস্থায় স্বামীর চিতায় আরোহণ করতেন। সেই সহমরণ বা সতীদাহ-প্রথা কী ভীষণ! মৃত স্বামীর চিতায় আরূঢ়া নারী চিতানলের দহন-জ্বালায় চিতা হতে বেরিয়ে আসতে চাইতেন।

আর তখনই বাঁশ দিয়ে তাঁকে চেপে ধরা হত, প্রহার করা হত। সেই সে অসহায়ার সে কী আর্তনাদ—সে কী বিষাদ—সমাজের সে কী প্রমাদ! তখন বাল্যবিবাহ, শেষপর্যন্ত নারীর জীবনকে করত দুর্বিষহ,—জীবনকে সুন্দর নন্দন বন করার পথে সেই বৈধব্য প্রদান করত প্রবল বাধা।

তখন, পুরুষের বহুবিবাহ সমাজ-জীবনকে করত নিগ্রহ।

তখন দেশের মানুষের মধ্যে মিত্রভাবে গলাগলি বড় নেই; আছে দলাদলি।—দলাদলির ফলে মানবজীবন দলিত হয়, সে বোধ নেই।

ভারতের সেই দীনতা ও হীনতার অন্ধকারময় যুগে আবির্ভূত হলেন রামমোহন—মোহন রামমোহন।

রামায়ণ মহাকাব্যের রাম দশটি অবতারের অন্যতম। মানুষের সমাজের অসৎ ভাবের কালো ঘুচিয়ে, সৎভাবের আলোর সঞ্চার করবার জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই, ভারত-জীবনের সেই যে কালো কাল, তখন রামমোহনই হয়েছিলেন ভারত-জীবনের আলো।

ভারতের সেই তাভিহীন যুগের অবস্থা বহু বৎসর পূর্বে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় উপযুক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার কিয়দংশ এইরূপ: "রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল;.........বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল।......অন্নের বিচারই ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল; অন্নশুদ্ধির উপরই বিশেষ ভাবে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করত। স্বপাক হবিষ্যভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম কিছুই ছিল না।......

"তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প হয়। তখন অন্ধকারের কাল, বঙ্গভূমি তিমিরাবৃত অরণ্যভূমি, রাক্ষসভূমি ছিল, ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত; তিনি একা

অজ্ঞাত শত সহস্র শত্রুদ্বারা আবৃত হইয়া, কুঠার হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যা অরণ্য সমভূমি করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার জীবনের এই মহান্ লক্ষ্য ছিল যে, পৃথিবীর সকল লোকেই কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পুরাতন অনাদি ঈশ্বরকে উপাসনা করে এবং পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে।

"বঙ্গদেশের এই অবস্থায় রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম, তখন হইতেই তিনি স্বদেশবাসীর জ্ঞান, ধর্ম ও সমাজের উন্নতিকল্পে আপনাকে ব্রতী করিয়া ভারতের তিমিরাচ্ছন্ন সময়ে, বিবিধ কুসংস্কার অপনোদন-মানসে আজীবন সংগ্রামরত ছিলেন।"

রামমোহনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—

"মানবের আত্মাকে রামমোহন অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন।… …সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও দাসত্বকে তিনি এইজন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই কারণে পৃথিবীর যে-কোন বিভাগের লোকে স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করিত, তাহারই সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ হইত, এবং স্বাধীনতালাভ-প্রয়াসে কোনো জাতি অকৃতকার্য হইতেছে জানিলে তিনি মর্মাহত হইতেন। ইটালীয়ানগণ অনেক চেষ্টার পর যখন অষ্ট্রীয়াবাসিগণের নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেই সংবাদে রামমোহন রায় কলিকাতাতে শয্যাস্থ হইলেন……। অপর দিকে স্পেনে যখন নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তিনি আনন্দে কলিকাতার টাউন-হলে ভোজ দিলেন। ……রামমোহন রায় ফারসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, যদি দেখিতেন যে স্বাধীনতাকামী-পক্ষের পরাজয় হইতেছে তাহা হইলে দরদর ধারে তাঁহার দুই কপোলে অশ্রুধারা বহিত। ……ইংলণ্ড গমনকালে গুডহোপ অন্তরীপে জাহাজে পড়িয়া গিয়া রামমোহন রায়ের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি

দেখিলেন যে, ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছে তখন ভগ্নপদ লইয়াই সেই জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।...ভগ্নপদে অতি কষ্টে ফরাসী জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন।......

"তাঁহার ইংলণ্ড-বাসকালে, ১৮৩১ সালে,......রিফর্ম বিলের স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার প্রস্তাব হয়। রামমোহন রায় সেই প্রস্তাবে......প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন যে ঐ আইন বিধিবদ্ধ না হইলে তিনি ইংলণ্ডের অধিকারে থাকিবেন না......স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমি আমেরিকাতে গিয়া বাস করিবেন।"

রামমোহনের জীবনী আমাদের পক্ষে এক সঞ্জীবনী।

বংশ-পরিচয়

অভিরাম রামমোহন ব্রাহ্মণ-কুলের সন্তান। রামমোহনের প্রপিতামহের নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সময়ে তিনি ছিলেন নবাবের অধীনে একজন কর্মচারী। তিনি খাজনা আদায় করিতেন। তাঁর কর্ম-গুণে তিনি 'রায় রায়ান' উপাধি প্রাপ্ত হন। মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁকে সেই উপাধি প্রদান করেন। সেই সময় হতেই সেই বংশে "রায়" পদবী প্রচলিত।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত একটি গ্রাম। তার নাম শাঁকাসা। সেই শাঁকাসা গ্রামে ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের আদি বাসস্থান।

কৃষ্ণচন্দ্র কার্য-উপলক্ষে কোন কোন সময়ে কৃষ্ণনগরে আগমন করতেন। তখন সেখানে নাকি ছিলেন এক সাধু মহাপুরুষ। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হন। সর্বদাই তাঁর সৎ সঙ্গ লাভ করতে চান। সেই শুভ ইচ্ছার বশে, শেষ পর্যন্ত, কৃষ্ণচন্দ্র শাঁকাসা গ্রা[illegible] পরিত্যাগ করেন। কৃষ্ণনগরের নিকটে রয়েছে রাধানগর। কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের সেই রাধানগরে বাসস্থান গ্রহণ করেন।

সাধু-সঙ্গ লাভের বাসনায় কৃষ্ণচন্দ্র বাস-গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন। তিনি যে কিরূপ সৎস্বভাব সম্পন্ন ছিলেন, ধর্ম যে তাঁর মর্ম কি

পরিমাণে অধিকার ক'রেছিলে, ঐ ঘটনা থেকেই সেটা উপলব্ধি করা যায়।

রামমোহনের পিতামহ ব্রজবিনোদ ঃ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-বিটপীতে তিনটি পুত্র-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছিল।—তিনি ছিলেন তিনটি পুত্রের পিতা। সেই পুত্রদের নাম ঃ হরিপ্রসাদ, অমরচন্দ্র, ব্রজবিনোদ।

ব্রজবিনোদ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। ছিলেন সাতটি পুত্রের পিতা। সেই সময়ে আলীবর্দী খাঁ ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব। ব্রজবিনোদ ছিলেন তাঁর অধীনে একজন কর্মী। তখন ভারতের পূর্ব অঞ্চলের শাসক ছিলেন দ্বিতীয় শাহ আলম। ব্রজবিনোদ তাঁর কর্মগুণে বহুবার দ্বিতীয় শাহ আলমের মিত্রের কাজ সম্পাদন করে দিয়েছিলেন।

ব্রজবিনোদ অতিশয় সৎ হলেও, তাঁর কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি তেমন সৎ হন নি। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত চাকরি পরিত্যাগ করেন। তাঁর জীবন-দিনের শেষ বেলা স্বগ্রামেই অতিবাহিত হয়।

রামমোহনের পিতা রামকান্ত

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে।"

—একদিন এসে উপস্থিত হল ব্রজবিনোদের অন্তিমকাল। তিনি পরপারের দিকে উড়িয়ে দিতে উদ্যত হলেন তাঁর জীবন-তরীর পাল। হরিনাম ধ্বনি করতে লাগলেন অবিরাম।

সেই সময়ে ব্রজবিনোদের নিকট এসে উপস্থিত হলেন একটি মানুষ। তিনি শাক্ত মতাবলম্বী ব্রাহ্মণ। নাম—শ্যাম ভট্টাচার্য।

তিনি ব্রজবিনোদকে বলেন, "হে ব্রহ্মপথ-যাত্রী ব্রাহ্মণ, আপনার আছে পুত্র। আমার আছে কন্যা। আপনার পুত্রের সঙ্গে পরিণীতা হয়ে আমার কন্যা হোক ধন্যা,—এইটিই আমি চাই। আমার কন্যার নাম তারিণী।"

ব্রজবিনোদ তাঁর সব কয়টি পুত্রকে একে একে ডাকলেন। তাঁদের জানালেন শ্যাম-এর প্রস্তাবের কথা।

ব্রজবিনোদ বৈষ্ণব। শ্যাম শাক্ত। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে অপ্রীতি তখনকার কালে প্রায়ই দেখা যেত। তাই ব্রজবিনোদ তাঁর কেবলমাত্র একটি পুত্রের মুখ হতেই ঐ বিবাহ-প্রস্তাবের অনুকূল অভিমত প্রাপ্ত হলেন। সেই পুত্রের নাম রাম—রামকান্ত।

রামকান্তের সঙ্গে তারিণী দেবীর বিবাহ যথারীতি সুসম্পন্ন হয়ে গেল। কিন্তু রামকান্তের পিতা ব্রজবিনোদ তাঁর পুত্রের পরিণয় দর্শন ক'রে যেতে পারেন নি। সেই পরিণয়ের পূর্বেই তিনি পরলোকগত হন।

ঐ রামকান্ত রামমোহনের পিতা। ঐ তারিণী দেবী রামমোহনের মাতা।—রামকান্ত-তারিণী রামমোহনের জনক-জননী।

তারিণী দেবী রামকান্তের একমাত্র পত্নী নন, প্রথমা পত্নীও নন। তিনি রামকান্তের দ্বিতীয়া পত্নী।

রামকান্তের প্রথমা পত্নীর নাম সুভদ্রা দেবী। সুভদ্রা কোন সন্তানের জননী হন নি। রামকান্তের তৃতীয়া পত্নীর নাম রামমণি দেবী

রামকান্তের ঐ তিনটি বিবাহ।

রামকান্ত ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ, আত্মসম্মান জ্ঞান-পরায়ণ।

রামকান্ত সিরাজ-সরকারে—নবাব সিরাজউদ্দৌলার সরকারে চাকরি করতেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সম্পূর্ণ নামটি হচ্ছে—নবাব মনসুরোল মোলক্-সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মিরজা মোহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর। রামকান্ত কিন্তু চাকরির চাক[illegible] নিজেকে চিরদিনের জন্য অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে দে'ন নি।—যখন তিনি দেখলেন, নবাব সরকারের ব্যবহার আত্মসম্মানের হানি করছে তাঁর, তখন সেই চাকরির সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রাখলেন না আর।—পদত্যাগ করলেন।

বিচক্ষণ রামকান্ত বর্ধমানের রাজমাতার উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করলেন। রাজমাতা বিষ্ণুকুমারীকে বৈষয়িক কাজমর্ম সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করাই হল রামকান্তের কাজ।

কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারের বিষের ক্রিয়া এড়িয়ে অবস্থান করা সর্বদা সম্ভব হয় না। রামকান্ত কর্তৃক রাজমাতাকে প্রদত্ত সুপরামর্শাদি নাকি তখনকার বর্ধমানের রাজা বাহাদুরের নিকট আদরণীয় হ'ল না। রামকান্ত হলেন রাজা বাহাদুরের বিরাগভাজন। তার ফলে হলেন নানারূপ অসুবিধাগ্রস্থ।

ঐ ব্যাপারের পর থেকে রামকান্ত আর পার্থিব সম্পদের মধ্যে ব্যাপৃত রইলেন না। তিনি পরম সম্পদের পথ—অমৃতের পথ—সর্ব দুঃখহারী হরিনামের পথ অবলম্বন করলেন। তারপর, একদা তাঁর জীবনের দীপ হয়ে গেল একেবারে ক্ষীণ; তিনি হলেন কাল-সমুদ্রে লীন।

রামমোহনের প্রপিতামহ, পিতামহ এবং পিতার জীবনে দেখা গেল, তাঁরা বিষয়কর্মে লিপ্ত থেকেও, বিষয়-বিষাক্ত হন নি—ধর্ম ছিল তাঁদের মর্মধর্ম।

ফুলঠাকুরাণী কে?: ফুলঠাকুরাণী একটি পরম পবিত্র ফুল! রামমোহনের মাতা তারিণীদেবীকে অনেকেই ফুলঠাকুরাণী বলে সম্বোধন করত।

ফুল একাধিক কারণেই মর্যাদা সম্পন্ন। ফুলঠাকুরাণীও একাধিক কারণেই মর্যাদার অধিকারিনী ছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, প্রজ্ঞাবতী; ছিলেন তেজস্বিনী এবং ধর্মপথানুবর্তিনী।

রামমোহন-জননীর মর্ম ছিল ধর্মধাম। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ সাধারণত চলার শক্তি রহিত হয়ে পড়ে, নড়াচড়া করতে চায় না, কাজকর্ম করতে চায় না, কিন্তু রামমোহনের মাতা তারিণী দেবী বার্ধক্যকে আমল দেন নি। ধর্ম-কর্মের পবিত্র প্রেরণা তাঁকে বল দান করত। তাঁর শেষ বয়সেও তিনি অশেষ প্রশংসার কার্য সম্পাদন করেন।—

পদব্রজেই গমন করেন শ্রীক্ষেত্রধামে বা পুরীধামে। সেই জগন্নাথক্ষেত্র তারিণী দেবীকে যেন দিব্যনেত্র দান করেছিল। তিনি বহুদিন যাবৎ জগন্নাথদেবের মন্দির মার্জন কর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

তারিণীদেবী ছিলেন ধনীগৃহিণী। কিন্তু কোনরূপ দম্ভধ্বনি কোনদিন তাঁর মুখ হতে প্রকাশিত হয়নি। সেই নারীর ধমনী যেন ধর্মানুরাগ-রক্তে পরিপূর্ণ ছিল। দীনকে অন্নদান-কর্মে তারিণী দেবী কোনদিনই দীনতা প্রকাশ করেন নি। তারিণীর মধ্যে যেন ভবতারিণীর প্রভাবই পরিদৃষ্ট হত।

রামমোহনের মহা-আবির্ভাব

সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'গীতা' সর্বকালের সর্বমানবদের মিতা,— হিতপথ প্রদর্শক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

হে ভারত বা অর্জুন, যখন ধর্মের হানি হয়, অধর্মের আধিক্য হয়, তখন আমি আবির্ভূত হই?

কেন তিনি আবির্ভূত হন?

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—সৎ লোকদের রক্ষা করবার জন্য দুর্বৃত্তদের বিনষ্ট করবার জন্য, আর ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য আমি আবির্ভূত হই—যুগে-যুগেই আবির্ভূত হই।

রামমোহন রায় এই দেশে যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগে এই দেশে গীতাগ্রন্থে উক্ত ঐরূপ অবস্থা বর্তমান ছিল। মানুষ যেন বেহুশ হয়ে পড়েছিল। নানারূপ অনাচার-কদাচার এই দেশকে যেন দিচ্ছিল আছাড়, সমাজের মেরুদণ্ডে দণ্ডাঘাত করছিল। অনুর্বর অন্ধকার উর্বর ভারতভূমিকে গ্রাস ক'রে বসেছিল। তখন ভারতের

পক্ষে সেইরূপ একজন মানুষ ছিল প্রয়োজন—যে মানুষ ভারতকে ভাতির পথ প্রদর্শন করবে। সেই মানুষ রাজা রামমোহন রায়।

অন্ধকার দূরীভূত করবার জন্য সূর্য পূর্বদিকে উদিত হন। ভারত সমাজের অন্ধকার দূর করবার জন্য রামমোহন ভারতের পূর্ব অংশে আবির্ভূত হলেন।

তখন ১১৭৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস। খৃষ্টীয় ১৭৭২ সালের মে মাসের ২১শে তারিখ। ঐদিন দেখা গেল, হুগলী জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধানগরে একটি শিশু হ'ল ভূমিষ্ঠ। রামমোহন রায় হলেন ভূমিষ্ঠ।—সেইক্ষণ হতে শুরু হল ভারতের ইষ্ট।

ভারত-জ্যেষ্ঠ রামমোহন জ্যৈষ্ঠ মাসে আবির্ভূত হন। রামমোহন রাম ভাব নিয়ে এসেছিলেন, রান-ভাব দেশকে দিয়েছিলেন।

রামমোহনের এক ভ্রাতা ছিলেন। তাঁর নাম জগন্মোহন। ভ্রাতৃদ্বয়ের এক ভগিনীও ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠা। তাঁর স্বামীর নাম ছিল শ্রীধর মুখোপাধ্যায়।

বাল্যে শ্রীমান রামমোহন : মোহন রামমোহনের বাল্যকালেই দেখা গিয়েছিল তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, তাঁর স্মরণশক্তির প্রাবল্য।

শিশু রামমোহন গুরুমহাশয় বা পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হলেন। তাঁর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হল।

বহু সাহিত্যাকাশের পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ নাকি একদিনের মধ্যেই বাংলা স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষা করে ফেলেছিলেন। ঐ দুই বিরাট ব্যক্তির পূর্ববর্তী শিশু রামমোহনও কি সেইরূপ ক'রেছিলেন?

রামমোহন পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ কালে, একজন মৌলবী সাহেবের নিকটও অধ্যয়ন করতেন। কি অধ্যয়ন করতেন? অধ্যয়ন করতেন পার্শী ভাষা—তখনকার রাজভাষা। তখন পার্শী ছিল—বাংলা ভাষার পড়শী বা প্রতিবেশী।

পাটনায় পাঠার্থী রামমোহন : শিশু রামমোহন মোহন হয়ে

উঠতে লাগলেন। বয়ঃক্রম হ'ল নয় বৎসর। রামমোহনের পিতা রামকান্ত ভাবলেন আমার রামকে বিদ্যাবিষয়ে অভিরাম করে তোলা প্রয়োজন।

পাটনা ভারতের একটি প্রখ্যাত জনপদ। সেই যুগে পাটনা ছিল পার্শী ও আরবী ভাষা শিক্ষালাভের একটি প্রসিদ্ধ পীঠভূমি। নানাস্থান হতে বহু শিক্ষার্থী পাটনায় আগমন করত।

রামকান্ত তাঁর নবম বর্ষ বয়স্ক পুত্র রামকে পাটনায় প্রেরণ করলেন। যিনি এই দেশকে নব নব অনেক কিছুই দিয়েছেন, বিদ্যালাভের জন্য নবন বর্ষ বয়সে বাটি হতে তাঁর দূরবতী স্থানে গমন, সেইটাই তো স্বাভাবিক। বর্তমান যুগে যাতায়াত যানবাহন, বার্তা প্রেরণ প্রভৃতি শত শত বিষয়ে নানারূপ সুব্যবস্থা রয়েছে। সেযুগে সেরূপ কিছুই ছিলনা। কিন্তু রামমোহনের পিতা রামকান্তের এবং বালক রামমোহনের ছিল বিপুল মনোবল।—মনোবল অচলকেও সচল করে তোলে। তাই রামকান্ত বালক রামমোহনকে রাধানগর হতে সুদূর পাটনায় প্রেরণ করতে পারলেন, আর বালক রামমোহনও পিতা-মাতাকে ছেড়ে সেখানে গমন করে, সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন। পুত্র এবং তাঁর পিতা-মাতা বিদ্যালাভ বিষয়ে কিরূপ আগ্রহশীল ছিলেন, ইহা তার একটি বিশদ প্রমাণ।

বালক রামমোহন কতদিন পাটনায় অবস্থান করলেন?—অবস্থান করলেন তিন বৎসর। পার্শী ও আরবী ভাষা খাসা রকমেই শিক্ষা করলেন। দার্শনিক প্রবর এরিস্টটলের নীতি-গ্রন্থের এবং ইউক্লিডের জ্যামিতিক অনুবাদ আরবী ভাষায় তখনও ছিল। রামমোহন আরবী ভাষায় সেই সব পাঠ করলেন।

কেবল তাই নয়। অল্প বয়স্ক রামমোহন আরবী ভা[illegible]তে মুসলিম ধর্মগ্রন্থ কোরাণ অধ্যয়ন করলেন। সুফী কবিদের কবিতা এবং মোতা জোলাদের দর্শনশাস্ত্রও পাঠ করলেন। তারপর দেখা গেল, সেই অল্প বয়স্ক রামমোহন সুবিদ্বান মৌলভীদের সঙ্গে ধর্ম এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বেশ জোরালো ভাবেই তর্ক-আলোচনা করছেন।

রামমোহন যখন প্রবীণ হয়ে উঠেছেন, তখন প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয়েছে, তিনি তেষট্টিটি শাখা-সম্পন্ন মুসলিম ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায় মৌলভীদের অপেক্ষা কম পণ্ডিত নন। তাই অনেক মুসলমান রামমোহনকে বলতেন "জবরদস্ত মৌলবী"। রামমোহন মুসলমানদের ব্যবহারশাস্ত্র বা আইন শাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন।

রামমোহন রুমি, শামী, হাফেজ প্রভৃতি কবিদের লালিত্যময়ী কবিতা পরম আনন্দের সঙ্গে আবৃত্তি করতেন। সেই আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর চিত্ত যেন নৃত্য করত নব নব রঙ্গে!

পাটনায় পাঠ গ্রহণ করতে করতে ক্রমে রামের বয়ঃক্রম হ'ল দ্বাদশ বৎসর। রাধানগরের রামমোহন তখন রাধানগরে প্রত্যাগমন করলেন। আরবী ও পার্শী ভাষায় তাঁর বিদ্যা দর্শনে অনেকে স্মিতমুখে-বলাবলি করতে লাগল, "পাটনার বিদ্যাপীঠ থেকে কি একজন মৌলভী এলেন নাকি!"

সংস্কৃত অমৃতার্থী রামমোহন ঃ রামমোহন তখন আরবী শিখেছেন, পার্শী শিখেছেন। কিন্তু রামকান্ত ভেবে দেখলেন, রাম যদি না শেখে সংস্কৃত, তা হলে, রামের মন তো পাবেনা অমৃত, তার মন হয়ে থাকবে মৃত!—তাই রামকান্ত রামমোহনকে সংস্কৃতের অমৃত সমুদ্রে অবগাহন করাতে চাইলেন। সংস্কৃত ভাষা সম্যকরূপ কৃত হয়েছে বলেই, ঐ ভাষাটি ঐরূপ নাম প্রাপ্ত হয়েছে। কাশীধাম পুণ্যধাম, সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান। রামকান্ত রামমোহনকে সেই কাশী বা বারাণসীধামে প্রেরণ করলেন। রামমোহন কাশীধাম বা শিক্ষাধামে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করলেন। শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করলেন। সে সব কেবল মুখস্থ নয়, বুকস্থ করলেন—শ্রদ্ধার সঙ্গে আয়ত্ত করলেন। অতঃপর রাধানগরের রামমোহন রাধানগরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন সংস্কৃত-আরবী-পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত রামমোহনের বয়ঃক্রম কত বর্ষ? মাত্র ষোড়শ বর্ষ।

শ্রীমৎ শংকরাচার্য ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক বিদ্যাবারিধি

হয়ে উঠেছিলেন। রামমোহনও ষোড়শ বর্ষেই তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্য ষোল কলার চন্দ্রবৎ প্রতীয়মান হলেন।

প্রথম পুস্তক রচনা ঃ তখন রামমোহনের বয়স অল্প বটে। কিন্তু লোকে দেখতে লাগল, অল্প বয়স্ক রামমোহন অল্পে সন্তুষ্ট নন। অল্পে সুখ নেই ; ভূমাতেই সুখ ;—এ মহাতত্ত্ব তিনি অবগত হয়েছেন।

অল্প বয়স্ক রামমোহন চিন্তা বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, এক ঈশ্বরবাদই বা একেশ্বরবাদই প্রশস্ত—একেশ্বরবাদ এবং মুর্তিপূজা সমপর্যায়ের নয়। তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত তিনি নানাজনের নিকট প্রকাশিত করতে লাগলেন। তাঁর পিতা রামকান্তের সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রীয় আলোচনা চলতে লাগল। রামকান্ত দেখলেন, হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী রামমোহনের মনঃপুত নয়। ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের মতিগতি দর্শন ক'রে রামকান্ত হর্ষ লাভ করলেন না ; বিমর্ষ হলেন।

ঐ সময়ে রামমোহন একখানি পুস্তক রচনা করলেন। সেই পুস্তকের নাম "হিন্দুদের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী" সেই পুস্তকে রামমোহন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত পূজাপদ্ধতি ইত্যাদির প্রশংসা করতে পারলেন না। সেই ধর্মপুস্তক দর্শন ক'রে রামমোহনের পিতার মর্ম যেন রোষভয়ে ঘর্মময় হয়ে উঠল।

পুত্রের প্রণীত ঐ পুস্তক দর্শনে, রামমোহনের জননী তারিণীদেবীও প্রসন্ন হতে পারলেন না। তিনি ছিলেন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত পূজা পদ্ধতিতে নিষ্ঠাশীলা। তিনি ভাবলেন, আমার রাম রামোচিত কাম না ক'রে, অরামোচিত কার্য কেন করছে? দিন দিন সে একি হচ্ছে!

রামমোহন যেরূপ দৃঢ়চেতা, তাঁর পিতা-মাতাও [illegible] দৃঢ়চেতা। ধর্মমত নিয়ে তাঁরা ভিন্নমত হলেন। তার ফলে, রামমোহন হলেন গৃহ হতে বিতাড়িত। আদর্শের সেই সংঘর্ষে, আদর্শেরই হ'ল জয়।

নন্দকুমার ঃ এই নন্দকুমার মহারাজ নন্দকুমার নন। ইনি নানা

শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালংকার নামক এক পূতচেতা পুরুষ। অল্প বয়স্ক রামমোহনের গুণরাশির জন্য নন্দকুমার বিদ্যালংকার মহোদয় রামমোহনকে যথেষ্ট প্রীতি করতেন। রামমোহনের ধর্মমতকে তিনি প্রকৃত ধর্মমত ব'লে মনে করতেন।

নন্দকুমার বিদ্যালংকার তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন ক'রে সাধনা করতেন। পরে তাঁর নাম হয় কুলাবধৌত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী।

তিব্বত যাত্রী দুঃসাহসী কিশোর রামমোহন ঃ ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক রামমোহন এখন গৃহ হতে বিতাড়িত, পিতামাতার প্রীতি দৃষ্টি মিষ্টি হতে বঞ্চিত। কিন্তু রামমোহন গতানুগতিকতার গর্তে পড়ে থাকবার মতো মানুষ ছিলেন না।

রামমোহন তাঁর ধর্মমতকে সম্বল করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। ঐ সময়ে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। সন্ন্যাসী দেখলেন, যৌবন উন্মুখ রামমোহনও যেন এক সন্ন্যাসী। রামমোহনের মুখেই সন্ন্যাসী শ্রবণ করলেন, চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই রামমোহন সন্ন্যাসী হতে উদ্যত হয়েছিলেন ; কিন্তু তাঁর পিতা-মাতার নিকট হ'তে বাধা পেয়েছিলেন।

রামমোহন তাঁর ইষ্টার্থী সেই সন্ন্যাসীর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

রামমোহন এইবার ভারত হতে যাত্রা করলেন তিব্বতের অভিমুখে।

কেহ কেহ মনে করেন, সেই সন্ন্যাসীর পরামর্শেই তিনি তাই করলেন।

কেহ কেহ ধারণা করেন, বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করবার জন্যই রামমোহন তিব্বত যাত্রা করলেন।

তিব্বতের দিকে চলেছেন ভারতপুত্র রামমোহন। পথ নেই। কিন্তু পথ তাঁকে ক'রে নিতে হচ্ছে। শ্রবণ করছেন হিংস্র শ্বাপদ-কুলের গর্জন। কখনও বা দর্শন করছেন তাদের করাল ভয়াল বদন ; সুতীক্ষ্ণ নয়ন, নখরদংষ্ট্রা। শুরু হয়ে যায় ঝটিকার ঝংকার হুংকার। পতিত হয় বজ্র। অন্ধকার অন্ধ করে ফেলে চতুর্দিক।

দস্যু-তস্করেরও দর্শন মেলে—রোমহর্ষণ দর্শন। অন্নের অভাব মুমূর্ষু ক'রে ফেলে হৃদয়ের মহাভাব। ক্লান্তি পথিককে ক্লীব ক'রে ফেলতে চায়। সর্বনাশা হতাশা হৃদয়ে নিতে চায় বাসা।

পথে পথে পর্বত আরচণ করে পরবৎ—অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করে।

কিন্তু বাধা বীরব্রত মানুষকে অধম গাধা বানিয়ে ফেলতে পারে না। বাধা বীরের সম্মুখে হয়ে যায় গাধা ; হয়ে যায় ধাঁধা! বীর-কিশোর রামমোহনের পথের বাধাও হল তদ্রূপ।

রামমোহনের চরণ চলে বিপুল বলে। পর্যটক বীর বালক, বহু দিন, বহু রাত্রির পরে, মহাদ্রি হিমাদ্রির জনমানবহীন তুষার রাজ্যে উপনীত হয়। কিন্তু তবু বালক ভীত নয়। সে তখন চায় আত্মহিত, বিশ্বহিত।

দেখতে হবে,
জানতে হবে,
জানাতে হবে,
জানাতে হবে!
এই মহাধ্বনি
উঠে রণরণি,'
রামের হৃদয়-যন্ত্রে,
দুর্জয় জয়-মন্ত্রে।

কাফ্রীদের আফ্রিকায়, মরুভূমে-মরুভূমে, অরণ্যে-অরণ্যে, সুমেরু দেশে, কুমেরু দেশে, মধ্য এশিয়ায়, সাগরে-মহাসাগরে, হিমাদ্রির শিখরে-শিখরে পর্যটকদের পর্যটন, সে হচ্ছে বয়স্ক ব্যক্তিদের পর্যটন, প্রায়শঃই দলবদ্ধ হয়ে পর্যটন। সে পর্যটন যদি হয় কাব্য, [illegible], অপ্রাপ্তযৌবন রামমোহনের ঐ পর্যটন এক মহাকাব্য, মানুষের চিরকালের শ্রাব্য ও অধ্যেতব্য।

ভারত, তিব্বত,—এই দুইটি অনুপ্রাশ রসযুক্ত শব্দ। ভারতপুত্র রামমোহনের ঐ তিব্বত যাত্রাও অতিশয় অমৃত রসময় একটি বিষয়।

রামমোহনের সেই যাত্রাক্ষণ হতে ভারতে যেন আরম্ভ হ'ল এক নব অব্দ।—নব জাগরণের অব্দ।—নবভাবে ধর্মমতের আবির্ভাব, বাঙ্গলা গদ্যের প্রকাশ-বিকাশ, সতীদাহ বহ্নি চিরতরে নির্বাণ, এবং আরও অনেক কিছুই জারগণ ক্ষেত্রে নেত্রপথে পতিত হয়।

রামমোহন বন্ধুর পথে তিব্বতে উপস্থিত হলেন বন্ধুর মতো। তিব্বত ভারতপুত্রকে বলল, "স্বাগত।"

শাস্ত্র মানুষের জীবনযুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র, এ যুক্তি কাট্য নয়, অকাট্য। রামমোহন হিন্দু শাস্ত্রের চর্চা করেছেন; মুসলিম শাস্ত্রের চর্চা করেছেন; এইবার আরম্ভ করলেন বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চা।

রামমোহন লক্ষ্য করলেন, এক বৌদ্ধ পুরোহিত এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন,—এরূপ একটা মত তিব্বতে তখন শ্রুত হওয়া যায়।

রামমোহন তখন সেখানে অভিমত প্রকাশ করলেন, ঐ মত মিথ্যা।

তখন সেখানে লাভ করলেন শত্রুতা। তাঁকে হত্যা করার হাতিয়ারও উদ্যত হল। কিন্তু তাঁর প্রতি প্রীতিরও অপ্রতুলতা ছিল না সেখানে। ভারতপুত্রের প্রাণ রক্ষায় বদ্ধপরিকর হলেন তিব্বতের পুত্রীরা। সেখানকার নারীশক্তি সংঘটন করল রামমোহনের বিপদমুক্তি।

রামমোহন অনুভব করলেন, নারী জগতের জীবন-নাড়ী। মাতৃজাতি দাত্রীজাতি।

প্রথম যৌবনযুত রামমোহন প্রায় চারি বৎসরের অধিককাল বিদেশে পর্যটন করলেন। তারপর বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞান এবং তিব্বতী নারীদের মমতা সম্পদ নিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এদেশে প্রায়শঃই দেখা যায়, দুঃসাহসিকতার কাহিনী-পূর্ণ উপন্যাস অথবা গল্প রচনার উপাদান প্রাপ্তির জন্য অনেকেই বিদেশী সাহিত্যের দ্বারস্থ হন। কিন্তু কিশোর রামমোহনের তিব্বত যাত্রা কাহিনী যে কত বড় দুঃসাহসের কাহিনী, কিরূপ উদ্যমের কাহিনী, কোন লেখনী কি তা বর্ণনা দিয়ে দুঃসাহসিকতার গল্প-উপন্যাস রচনা করতে পারে না? যদি করা হয়, তা হ'লে, ভারতের ভালো ছেলের কর্তব্যই সম্পাদন করা হবে।

রামমোহনের পিতা রামকান্ত রামমোহন বিহনে অশান্ত হয়ে অবস্থান করছিলেন ঃ মাতা তারিণী কাল কাটাচ্ছিলেন তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে, আর অশ্রুপাতে! তাঁরা পশ্চিম ভারতে লোক প্রেরণ করলেন তাঁদের রামকে, তাঁদের হৃদয়-অযোধ্যায় আনয়ন করবার জন্য। রামমোহন গৃহে এলেন। মাতা-পিতার পদরজ মস্তকে ধারণ করলেন।

রাম পড়েন রামায়ণ ঃ রামমোহনের ধর্মজিজ্ঞাসা দিন-দিন প্রবল হতে প্রবলতর হতে লাগল। তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন তপস্যায় রত হলেন। সেই তপস্যার এক দিবসের একটি কাহিনী-এখন এইখানে দেওয়া হল ঃ

একদিন রামমোহন যথারীতি প্রাতঃস্নান করলেন। দেহের স্নানের পর, চিত্তের স্নান আরম্ভ করলেন—আদি কবি বাল্মীকির রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ অধ্যয়ন করতে লাগলেন একটি গৃহে ব'সে। রামায়ণ অধ্যয়ন সেই প্রথম। পূর্বে তিনি রামায়ণ পাঠ করেন নি। অধ্যয়ন চলতে লাগল। আকাশে সূর্যের গতিও চলতে লাগল। রামমোহনের মধ্যাহ্ন-আহারের সময় হ'ল। কিন্তু অধ্যয়ন ক্ষান্ত রাখার সময় তাঁর হ'লনা। তারপর, সূর্য যখন অস্ত যায় যায়, তখন রামমোহনের সম্পূর্ণ রামায়ণ পাঠ সমাপ্ত হয়ে যায়। সকাল সাত ঘটিকায় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ শুরু, প্রায় সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় শেষ—সাতে শুরু সাতে শেষ, এরূপ বলা যায় কি?

রামমোহনের ঐরূপ একাগ্রতা, ঐরূপ নিষ্ঠা ধর্মক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে বর্তমান ছিল।

রামায়ণের রাম নির্বাসিত হয়েছিলেন একবার মাত্র। [illegible] রামমোহন তাঁর প্রচারিত একেশ্বরবাদ ধর্মমতের জন্য পিতামাতা কর্তৃক গৃহ হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন একাধিকবার। তথাপি তাঁর ধর্মমত-ধর্মপথ তিনি পরিত্যাগ করেন নি! স্বার্থ তাঁর হৃদয়কে আর্ত করতে পারেনি।

বৈষয়িক ক্ষেত্রে : সেই যুগে একদা এক ভদ্র ব্যক্তি তাঁর নয় বৎসর বয়স্ক পুত্রের বিবাহ কার্য সম্পাদন করলেন। সেই ভদ্র ব্যক্তি রামকান্ত রায়, আর সেই নবম বর্ষ বয়স্ক বালক রামমোহন রায়। রামমোহনের তিনটি বিবাহ। নয় বৎসর বয়স্ক রামমোহনের প্রথম বিবাহের অল্পকাল পরে, আবার একটি কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। রামমোহনের প্রথম পত্নীর পুত্র হচ্ছেন রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ। তাঁরা তাঁদের বিমাতা উমাদেবীকে তাঁদের মাতারূপেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন, বলা যায়। তাঁর নিকট হতে মাতৃস্নেহই লাভ করেছিলেন সুধাধারার মতো।

রামমোহন তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির অংশরূপে কলিকাতায় একখানি বাড়ী পেয়েছিলেন। সেখানে তিনি ব্যবসায় কার্য করেছিলেন। রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর নামে দুইটি তালুক চার হাজার অপেক্ষা কিছু বেশী টাকায় তিনি ক্রয় করেছিলেন। তা থেকেও তাঁর প্রতি বৎসরে হাজার পাঁচেক টাকা উপার্জন হত।

বিশ সহস্র মুদ্রা দিয়া তিনি কৃষ্ণনগর তালুক ও শ্রীরামপুর তালুক ক্রয় করেন। ঐ সকল সম্পত্তি হতে তাঁর বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ লাভ হত।

রামমোহন কলিকাতায় দুইটি বাড়ী ক্রয় করেন। একটি আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে, অন্যটি চৌরঙ্গীতে। প্রথম বাড়ীখানি ষোল হাজার এবং দ্বিতীয় বাড়ীখানি বিশ হাজার টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল। তার পল্লীগ্রামস্থ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন জগন্নাথ মজুমদার এবং ভবানী ঘোষ।

রামমোহন চাকরি প্রাপ্তির আশায় একবার কাশীধামে গমন করেন। তিনি যখন সেখানে ছিলেন, তখন তাঁর পল্লীভবনে তাঁর প্রথম পুত্র রাধাপ্রসাদ ভূমিষ্ঠ হন।

অ্যানড্রু র‍্যামসে নামক এক ইংরাজ ছিলেন বারাণসীতে একটা কুঠির কর্তৃপক্ষ। তিনি একবার রামমোহনের নিকট হতে কয়েক

হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের দুই জনের মধ্যে প্রীতির ভাব গড়ে উঠেছিল।

রামমোহন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মী নিযুক্ত হয়েছিলেন। সে হচ্ছে খৃষ্টীয় ১৮০৩ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। তাঁর কর্মস্থল ছিল এখনকার বাংলা দেশের ঢাকা-ফরিদপুরে বা দালালপুরে। তাঁর উর্ধ্বতন কর্মচারীর নাম ছিল উডফোর্ড।

ঐ সালের মে মাসে রামমোহনের পিতা রামকান্ত অত্যন্ত রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর জীবন অবসানের আশঙ্কা দেখা দেয়। রামমোহন সে সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি তখনই চাকরি পরিত্যাগ করে এসে পিতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন! পিতার পরলোক গমন তিনি দর্শন করেন। ধর্মনিষ্ঠ রামকান্ত শয্যাশায়ী অবস্থায় ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে ইহলীলা অবসান করেন।

পিতার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল রামমোহন পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করেন। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বনে সেটি করেন নি। সেই জন্য তাঁর মাতা তারিণীদেবী তাঁর প্রতি অপ্রসন্না হন। তাঁরই প্ররোচনা বশে, তাঁর পৌত্র (রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র) গোবিন্দপ্রসাদ, রামমোহনকে বিষয় সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করার জন্য আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেন। সেই মর্মপীড়াদায়ক মোকদ্দমায় রামমোহন হন জয়ী, গোবিন্দপ্রসাদ হন পরাজিত।

রামমোহনের জননী তারিণীদেবী ধর্মশীলা ছিলেন। রামমোহনও ধর্মশীল ছিলেন। তথাপি, ধর্ম-পথ সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকায় পুত্রকে বিষয়-সম্পত্তির অধিকারচ্যুত করার জন্য মাতা পুত্রের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেছিলেন। কিন্তু মোকদ্দমায় পুত্রেরই জয় হয়।

সেই বিচারকালে, ধর্মাধিকরণে বিচারকের সম্মুখে রামমোহনের অভিমত পরিত্যক্ত হয়েছিল ঃ তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন নি। তিনি অহিন্দু নন। হিন্দুধর্মের সার সত্যই তিনি প্রচার করেছেন। তাঁর ধর্মমত বেদ বিরুদ্ধ নয়।

গোবিন্দপ্রসাদের মাতা দুর্গাদেবীও রামমোহনের বিরুদ্ধে

মোকদ্দমা করার জন্য রামমোহন-জননীর নিকট হতে প্ররোচনা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

রামমোহনকে তাঁর ধর্মমতের জন্য স্বজনের সঙ্গেই ঐরূপ সংগ্রাম করতে হয়েছিল। পিতৃগৃহ হতে বহিষ্কৃত হয়ে রঘুনাথপুর নামক গ্রামে পত্নী ইত্যাদি সহ তাঁকে বসবাসও করতে হয়েছিল।

কেবল তাহাই নয়। দলবদ্ধ প্রতিকূল লোকদের নিষ্ঠুর আচরণেও রামমোহনকে ক্লেশ প্রদান করত। রামমোহনের সম্বন্ধে লিখিত একটি রচনায় দেখা যায়, প্রায় হাজার পাঁচেক লোকের দলপতি রামজয় বটব্যাল রামমোহনের বিপুল বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর দলের লোকেরা অতি প্রত্যূষে রামমোহনের ভবনের চতুষ্পার্শ্বে উৎপাৎ করত, তাঁর ভবনে গরুর হাড় নিক্ষেপ করত। মোরগের মতো শব্দও করত। কিন্তু, ঐ সব সত্ত্বেও, রামমোহন ছিলেন সত্যই মোহন। তিনি সেই অমিত্রদের প্রতি মিষ্ট ও শিষ্টবাক্য প্রয়োগ করতেন।

তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহিদ্দিন : পিতা রামকান্তের পরলোক গমনের পর রামমোহন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) মুর্শিদাবাদে গমন করেন। সেখানে উডফোর্ড সাহেবের অধীনে সেরেস্তাদারের কার্য প্রাপ্ত হন। রামগড়, ভাগলপুর এবং রংপুরে সেরেস্তাদার বা দেওয়ানের পদে কার্য করেন। দশ বারো বৎরর কার্য করার পর বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করেন। ডিগ্বী সাহেবের অধীনে তিনি কার্য করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতিভাব সঞ্জাত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ডিগ্বীসাহেব রামমোহনের একখানি পুস্তকের প্রকাশক হন এবং ঐ পুস্তকের ভূমিকাও রচনা করেন।

সরকারী কার্যকালে রামমোহম তাঁর কর্মদক্ষতা গুণে সর্বদাই কর্তৃপক্ষের প্রশংসা প্রাপ্ত হয়েছেন।

সাধারণত দেখা যায়, যিনি চাকরি করেন, তাকে নানারকম শর্তবদ্ধ হয়ে চাকরী করতে হয়। কিন্তু চাকরিকালে রামমোহন

তাঁর কর্তৃপক্ষকেই শর্তবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। এই হচ্ছে সেই শর্ত—তিনি যখন কার্য উপলক্ষে তাঁর কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হবেন, তখন তিনি কর্তৃপক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকা অবস্থায় কথা বলবেন না। তাঁকে চেয়ার দিতে হবে।

পৌরুষী পুরুষ রামমোহন তখনকার পরাধীন ভারতে পরাধীন চাকরিকালেও ঐরূপ স্বাধীন মনোবল প্রদর্শন করেছিলেন।

মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে, তিনি পার্শী ভাষায় "তুহফাৎ-উল্ মুয়াহিদ্দিন" রচনা ও প্রকাশ করেন। ওর অর্থ-'একেশ্বরবাদিগণকে প্রদত্ত উপহার।' পৌত্তলিকতা বা প্রতীক-উপাসনা অসার; একেশ্বরবাদই সার—এই ছিল ঐ পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

রংপুরে অবস্থানকালে, তাঁর ভবনে প্রায়শঃই সভা বসত। সেই সভায় তিনি ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ভাষণ দিতেন।

রাজদূতরূপে : রংপুরে কালেক্টর জন ডিগবী একদা রোগগ্রস্থ হন এবং ইংলণ্ডে চলে যান। তখন স্কট সাহেব হন কালেক্টর। তিনি রামমোহনের গুণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন।

তখন ইংরাজের পক্ষ হতে ভুটানের রাজার নিকট দূত প্রেরণের প্রয়োজন হয়। স্কট সাহেব রামমোহনকেই মনে করলেন ঐ কার্যের উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি রামমোহনকে দূতরূপে প্রেরণ করলেন। কৃষ্ণরাম বসু হলেন তাঁর সঙ্গী। তিনিও ইংরাজের একজন কর্মচারী ছিলেন।

নেপাল যুদ্ধে ভুটানরাজ যাতে নেপালের পক্ষে এবং ইংরাজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন; ভুটান ও ইংরাজ রাজ্যের সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ যাতে যুদ্ধে পরিণত না হয়; এবং আরো কয়েকটি রাজনৈতিক বিষয়ের যাতে সুরাহা হয়; এই সব হল রামমোহনের সেই দৌত্যের বিষয়। তাঁর দৌত্য সাফল্যমণ্ডিতই হয়েছিল, প্রশংসাও লাভ হয়েছিল।

বহু ভাষাবিদ : রামমোহন অল্প বয়সেই সংস্কৃত, আরবী এবং

পার্শী ভাষায় পারদর্শী হন। তিনি ইংরাজী ভাষা কখন শিক্ষা করেন?

বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রামমোহন প্রথম ইংরাজী শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন। অধ্যবসায় এবং মনোযোগ-বলে ক্রমে সেই ভাষায় সুপণ্ডিত হন।

তাঁর ইংরাজী রচনা ও বাক্যালাপে বহু ইংরাজ মুগ্ধ হয়েছেন। "Calcutta Journal" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জেম্‌স্ সিল্ক বাকিংহাম। তিনি রামমোহনের ইংরাজী ভাষা-জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করে গেছেন। ইংরাজ দার্শনিক জেরিমি বেন্থাম রামমোহনের নিকট লিখিত পত্রে রামমোহনের ইংরাজী রচনার বিস্তর প্রশংসা করেন।

রামমোহন কয়টি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন? অন্ততঃ দশটি ভাষা। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দুস্থানী, আরবী, পার্শী, গ্রীক, হিব্রু, ল্যাটিন, ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ—এই ভাষা কয়টির মধ্যে প্রায় সব কয়টিই তিনি খাসা রকমেই আয়ত্ত করেছিলেন।

তিনি নিজের নামটি ইংরাজী ভাষায় এইরূপে লিখতেন: Rammohun Roy।

কলিকাতার নবধর্ম ধ্বনি: রামমোহন ইংরাজের কার্য হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। বয়ঃক্রম চল্লিশ বর্ষ হয়েছে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ চলছে।

কলিকাতার তখনকার সার্কুলার রোডে একখানি ভবন। সেখানে তিনি বসবাস করছেন। ভবনখানি রামমোহনের জ্ঞাতি ভাই রামতনুর নির্মিত।

সেই ভবন এখনও বর্তমান। প্রবেশপথে রামমোহনের নামাঙ্কিত প্রস্তর ফলক এখনও দর্শকদের পুলক সঞ্চার করে।

ধর্ম কি—কাকে বলে ধর্ম—সে সম্বন্ধে জগতের বিভিন্ন শাস্ত্রই মূলত একমত। রামমোহন যুক্তি ও বিচার-বলে উপলব্ধি করেছিলেন

যে, মানুষের জীবন যুদ্ধে ধর্মই হচ্ছে তার প্রকৃত বর্ম-চর্ম। তাই তিনি ধর্মপ্রচারে যত্নশীল হলেন। মানুষ যাতে এই নশ্বর বিশ্বে এক ঈশ্বরের জ্ঞানলাভে উদ্যমশীল হয়—ব্রহ্মজ্ঞান যাতে ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার লাভ করে —সেই ব্রতে তিনি তাঁর দেহ ও মনকে ব্রতী করলেন, ধন ব্যয়ও করতে লাগলেন।

আত্মীয় সভা ঃ ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহন চারটি পন্থা অবলম্বন করলেন। প্রথম পন্থা ঃ লোকের সঙ্গে ধর্ম-সম্বন্ধীয় কথোপকথন এবং যুক্তিতর্ক। দ্বিতীয় পন্থা ঃ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় পন্থা ঃ ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ ও বিতরণ। চতুর্থ পন্থা ঃ সভা সংস্থাপন।

ধর্মপ্রচার যুদ্ধে চারিদিকে চলল তাঁর ঐ চার অভিযান। ঐ হ'ল ধর্মযুদ্ধের চতুরঙ্গ সেনা।

ধর্মাত্মা রামমোহন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে স্বীয় বাসভবনে "আত্মীয়-সভা" প্রতিষ্ঠিত করলেন। উপযুক্ত কাজই করলেন। তাঁর ভবনই যদি ঈশ্বর ভজনালয় না হয়, তবে আর কোন ভবনে তা হবে! পুষ্পোদ্যানে মধুমক্ষিকা আগমন করে। আত্মীয়-সভায় আগমন করতে লাগলেন বহু ব্যক্তি। তাঁরা বিদ্বান, ধনবান, প্রাণবান। হরিহরানন্দ তীর্থ-স্বামী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা) দ্বারকানাথ ঠাকুর, কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আত্মীয় সভায় উপস্থিত হতে লাগলেন।

ঐ ধর্মসভায় সুগায়ক গোবিন্দ মল্লের কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হ'ত ব্রহ্মসংগীত। হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থ হতে পবিত্র শ্লোকরাশি পাঠ করতেন সুপণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র।

দূরীভূত করবার জন্য মানুষের সকল বিবাদ ও বিষাদ, ঐ সভায় ধ্বনিত হত একেশ্বরবাদের নাদ।

প্রথম দুই বৎসর কাল রামমোহনের ভবনেই আত্মীয়-সভার

অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। তারপর কলিকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে ১৭৫০ শকাব্দের ৬ই ভাদ্র তারিখে রামকমল বসু মহাশয়ের ভবনে উপাসনা সভা সংস্থাপিত হয়।

মানুষের কর্মের ইতিহাস একরূপ হাঁস। সেই ইতিহাস-হাঁস কোন কোন সময় স্বর্ণ ডিম্ব প্রদান করে—উত্তম কর্ম সম্পাদন করে; উত্তম চিন্তা প্রচার করে।

কিন্তু এটাও দেখা যায়, সেই উত্তমকে সকলেই উত্তম ব'লে মনে করে না; এবং তার বিরুদ্ধতা করে। রামমোহন কর্তৃক ঐরূপে ধর্ম-প্রচারের পথেও অন্তরায় দেখা দিল। একশ্রেণীর মানুষের অন্তর বলে উঠল, রামমোহনের ঐ কাজ মোহন নয়, শোভন নয়। ঐ কার্যের বিরোধিতা করা প্রয়োজন। তাঁরা করলেনও তাই। তাঁরা বলতে লাগলেন, প্রতীক উপাসনার বিরুদ্ধে রামমোহনের ঐরূপ প্রচার একটা অনাচার, কদাচার। ঐ আত্মীয়-সভায় গরু বধ করা হয়, এরূপ মিথ্যাও প্রচার করা হতে লাগল। তার ফলে, লোকনিন্দা ইত্যাদির ভয় বশতঃ, অনেকে আত্মীয়-সভায় আগমন করা বন্ধ করলেন।

তাঁরা সত্যসন্ধের মতো কাজ করলেন না, অন্ধের মতো কাজ করলেন। বিচক্ষণতার উপর সেই বিচারের ভার।

রামমোহন কর্তৃক ধর্ম-প্রচারের পথে অন্তরায় দেখা দিলেও, রামমোহনের চিন্তা-তূণে নতুন কিছু ছিল ব'লে, তারই বলে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁর শৌর্য-শর তাঁকে করতে লাগল জগৎ-হিতের পথে সম্মুখে অগ্রসর।

আত্মীয়-সভ্য সংস্থাপনের অল্পকাল পরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল সমাজ-মন্দির। সমাজ-মন্দিরের দ্বার সর্ব মানবের জন্য অবারিত রইল। মন্দির-মধ্যে প্রাণীর প্রতি হিংসা, বলিদান, নৈবেদ্য, প্রতিমূর্তি ইত্যাদি নিষিদ্ধ হ'ল।

মন্দির কি নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হ'ল। প্রতিষ্ঠিত হ'ল দয়া, সাধুতা, ভক্তি, সুনীতি ইত্যাদি মহৎ ভাবরাশির সারবত্তা প্রচারের জন্য, একেশ্বরের প্রতি অনুরাগ বর্ধক কার্যাদির জন্য।

'অন্যে তোমার প্রতি যে কার্য করলে তুমি দুঃখ প্রাপ্ত হও, সেরূপ কার্য তুমি অন্যের প্রতি করবে না ;—এই মহান নীতি সর্ব মানবের জন্য উপদিষ্ট হ'ল।

ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন, ন্যায়মার্গ অনুসরণ, সত্য বাক্য কথন এবং বেদ-উপনিষদ চর্চা অবশ্য করণীয় ব'লে নির্ধারিত হ'ল।

ধর্মগ্রন্থ রচনায় রামমোহন ঃ ধর্ম কি ? কাকে বলে ধর্ম ? ধর্মের সংজ্ঞাসূচক একটি বিজ্ঞবাণী এইরূপ ঃ

ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ
প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
এস সংক্ষেপতো ধর্ম ঃ
কামাদন্যঃ প্রবর্ততে ॥

এই শ্লোকটির সোজা তাৎপর্য এইরূপ ঃ যেটা নিজের পক্ষে প্রতিকূল, সেরূপ কার্য অন্যের প্রতি করবে না ! সংক্ষেপে, এই হচ্ছে ধর্ম। অন্য যা কিছু সে সব কামনা-বাসনা বশেই করা হয়ে থাকে।

গ্রন্থ কাকে বলে, তা সকলেরই জানা আছে।

গ্রন্থ কি করে ?—গ্রন্থ দ্বারা কি হয় ?

গ্রন্থ এক মানুষের মনের সঙ্গে আর এক মানুষের মনের গ্রন্থি বন্ধন ক'রে দেয় ;—এক মানুষের মনের সঙ্গে আর এক মানুষের মনের দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা ঘটিয়ে দেয় ; অদৃশ্য শক্তির সঙ্গেও মানুষের মনের সংযোগ ঘটিয়ে দেয়। গ্রন্থ মানুষের চিন্তারাশি যুগ হতে যুগান্তরে, কাল হতে কালান্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। তাই মানব-সমাজে গ্রন্থের গুরুত্ব সমধিক। মানুষ বিশ্ব পথের পান্থ। তার পক্ষে উৎকৃষ্টতম অন্ন ও পানীয় হচ্ছে গ্রন্থ।

ধর্মপ্রচারক রামমোহন ধর্মগ্রন্থের প্রণেতা ও প্রচারক ছিলেন। "হিন্দুদের পৌত্তলিক প্রণালী" নামক পুস্তিকা তাঁর খুব অল্প বয়সের রচনা। তাঁর মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে, ১৮০৩-০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় পার্শী ভাষায় রচিত "তুহফাৎ-উল্-মুয়াহিদ্দিন।"

তিনি সংস্কৃত বেদান্ত সূত্রের একখানি ভাষ্য বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত করেন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বা ১৭৩৭ শকাব্দে। তার প্রকাশিত ঐ গ্রন্থ তিনি উদার উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে, লোকের মধ্যে বিতরণ করেন। ঐ গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ এবং ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়। তারপর বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় "বেদান্তসার"। ঐ বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৭৩৮ শকাব্দে বা ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে। পুস্তকখানি এদেশের খৃষ্টান সমাজে এবং ইয়োরোপেও প্রশংসা প্রাপ্ত হয়েছিল।

গ্রন্থ প্রকাশকরণ কার্যে তিনি কখনও শ্রান্ত হননি—অশ্রান্ত-ভাবেই তা করেছেন।

রামমোহন পঞ্চ উপনিষদ প্রকাশিত করেন। ১৭৩৮ শকাব্দে কেনোপনিষদ বা তলবকায় উপনিষদ এবং ঈশোপনিষদ। ১২২৪ সালে কঠোপনিষদ এবং মাণ্ডুক্যোপনিষদ। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মুণ্ডকোপনিষদ।

রামমোহন বেদ ও উপনিষদের মার্গ অনুসরণ করেছেন। হিন্দুদের ঐসব পরম গ্রন্থের প্রতি তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাশীল। সকলেই যাতে ঐসব পবিত্র গ্রন্থের প্রদর্শিত পবিত্র পথ অবলম্বন করে, রামমোহন পুনঃ পুনঃ সেই কথাই বলেছেন।

কি তোমার করণীয় ; কি তোমার করণীয় নয়,—সে বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ ; বেদই তোমার প্রধান শাস্ত্র ; রামমোহনের এইরূপ অভিমতই দেখা যায়।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, "শাস্ত্র" শব্দটি অনাদরণীয় নয়, [illegible]াদরণীয়। শাস্ত্র অনুসারে চলা উচিত,—এরূপ বাক্য উপহাসের বিষয় নয়। কারণ শাস্ত্র বলতে কি বুঝায়? শাস্ত্র বলতে বুঝায় কতকগুলো বিধি, নিয়ম-কানুন। ঐ সব পালন করলে, স্বাস্থ্য ভালো থাকে ; মনের অবস্থা ভালো থাকে ; মানুষে মানুষে ঝগড়া-বিবাদ দূর হয়, প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়।

কোন এক দেশের সরকার যে সকল আইন প্রচলিত করেন, সে

সকল আইনকে শাস্ত্র বলে অভিহিত করলে, প্রকৃতপক্ষে কোন ভুল হয়না। তবে, সাধারণত, ধর্মবিষয়ক বিধিকেই বলা হয় শাস্ত্র।

শাস্ত্রীয় বিচার-বিজয়ী ঃ যাদের চিন্তা-তূণ থেকে মানুষের হিত-জনক নতুন কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিরোধিতা ও শত্রুতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন! রামমোহনের বেলাতেও সেইরূপই হয়েছে।

রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করতে লাগলেন।

যদ্ বাচা নভ্যুদিতং, যেন বাগ্ অভ্যুদ্যতে,
যন্ মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনো মতম্,
তদ্ এব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদ্ ঈদম্ উপাসতে।

—উপনিষদের এই অমৃতময় বাণী রামমোহনের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল। ঐ বাক্যের সোজা তাৎপর্য হচ্ছে এইরূপ ঃ বাক্যদ্বারা যাঁকে প্রকাশিত করা যায় না, যাঁর দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়; মানুষ মন দ্বারা যাঁকে চিন্তা করতে পারেনা, যিনি মনের সব চিন্তা অবগত আছেন; তাঁকেই তুমি ব্রহ্ম ব'লে জেনো। মানুষ পদার্থের উপাসনা করে, তা ব্রহ্ম নয়।

সাকারবাদের বিরুদ্ধে রামমোহন যেন ভেরীনিনাদ ধ্বনিত করলেন। তখনই রামমোহনের কণ্ঠরোধ করবার জন্য নানা মানুষের কণ্ঠ হতে বিরুদ্ধ অভিমত এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, নিন্দার কোলাহল জেগে উঠল। দিকে দিকে সেই ধ্বনি ছুটল। কেবলমাত্র বঙ্গদেশে নয়, মাদ্রাজেও সেই মত্ততার নৃত্য দেখা গেল।

বিভিন্ন সময়ে সেই বিচার-কালে কোন কোন প্রতিপক্ষ রামমোহনকে যেন বিছার কামড় মেরেছেন—অর্থাৎ তীব্রভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু অবিরাম রামমোহন বিদ্রূপকরীদের প্রতি কখনও বিরূপ হননি। রামমোহনের অন্তরের রূপ কিরূপ ছিল, ঐ থেকে তা বুঝা যায়।

মাদ্রাজে সরকারী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন—তাঁর নাম শংকর শাস্ত্রী। তিনি রামমোহনের মতবাদের বিরুদ্ধে "মাদ্রাজ কুরিয়ার্" নামক একখানি পত্রিকায় প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন, 'নিরাকার' বা আকারহীন ব্রহ্মের উপাসনা বেদান্ত শাস্ত্রসম্মত বটে। কিন্তু সাকারভাবে নানা দেব-দেবীর উপাসনাও অশাস্ত্রীয় নয়।

শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ রামমোহন তখন শাস্ত্ররাশি হতে লব্ধ যুক্তিদ্বারা শংকর শাস্ত্রীর অভিমত অসার ব'লে যেন জলদনিনাদ তুললেন।

বঙ্গদেশে কলিকাতায় তখনকার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন মৃতুঞ্জয় বিদ্যালংকার মহাশয়। মৃতুঞ্জয় তাঁর অভিমত দিয়ে রামমোহনের অভিমতের পরাজয় সাধনে অগ্রসর হলেন। তিনি একখানি পুস্তক প্রচার করলেন, তার নাম "বেদান্ত-চন্দ্রিকা"। কেবলমাত্র ধর্মসম্বন্ধীয় অভিমতই প্রকাশিত হ'লনা, সেই সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-দুর্বাক্য-বাণও রামমোহনের উপর বর্ষিত হ'ল। কিন্তু ঐ কারণে সংযমী রামমোহনের সংযম শিথিল হ'লনা। ধর্ম বিষয়ের বিচারে রসনা ও মনের সংযমই বিধেয়, এই হল রামমোহনের উত্তর।

সুপণ্ডিত জনৈক গোস্বামী মহাশয়ও রামমোহনের অভিমতের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করলেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ভাগবত বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য—এই গোস্বামী মহাশয় এইরূপ প্রমাণিত করবার চেষ্টা করলেন। রামমোহন তখন যুক্তি প্রদর্শন করলেন—যে, ভাগবত বেদান্ত-ভাষ্য মোটেই নয়।

তৎকালে মাদ্রাজে এক অগাধ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নাম সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। তিনি আগমন করলেন কলিকাতায়। কলিকাতায় বড়বাজারের সুবিখ্যাত বিহারীলাল চোবে মহাশয়ের ভবনে "আত্মীয়-সভায়" অনুষ্ঠিত হ'ল শাস্ত্রবিচার সভা। এক পক্ষে রামমোহন অপর পক্ষে সুব্রহ্মণ্য। উভয়েই শাস্ত্রশস্ত্রধারী। কেউ কেউ চুপে চুপে অভিমত প্রকাশ করলেন, শাস্ত্রশস্ত্রধারী এই দুই যুযুধান।

তারপর শাস্ত্রীয় শ্লোক যেন শরবৎ বর্ষিত হতে লাগল। উপস্থিত জনমণ্ডলীর লাগল তাক। সবাই রইলেন নির্বাক। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সভায় সমাসীন ছিলেন।

যাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্মকাণ্ড অবলম্বন করেন না, তাঁরাও ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী,—সেই বিচারে এই অভিমতই বিজয়ী হ'ল। রামমোহন হলেন বিজয়ী।

ধর্ম সম্বন্ধীয় ঐরূপ বিচার-আনন্দে বৈষ্ণব প্রবর উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ও রামমোহনের সঙ্গে শাস্ত্র-বিচার করেছিলেন। কিন্তু রমেমোহনের অভিমত নস্যাৎ ক'রে দিতে পারেন নি। তিনি সে অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে নিয়েছিলেন।

হিন্দু শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন ক'রে, অমৃত লাভ করে, রামমোহন সে অমৃত মানুষের মধ্যে বিতরণ করলেন, মানুষের জন্য রেখে গেলেন,—এ অভিমত কি অযৌক্তিক?

খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের সঙ্গে বিচার-বিগ্রহ ঃ রামমোহনকে বিচার-বিগ্রহে বা বিচার যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল খৃস্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গেও। কলিকাতার নিকটস্থ শ্রীরামপুরে তখন ছিল খৃস্টধর্ম-প্রচারকদের এক বৃহৎ কেন্দ্র। তাঁদের একখানি পত্রিকার নাম ছিল "সমাচার-চন্দ্রিকা"। খৃস্টধর্মপ্রচারক একজন ইংরাজ একবার সেই পত্রিকায় অভিমত প্রকাশ করলেন যে, হিন্দুদের বেদাদি গ্রন্থ সারবান কিছু নয়। সেই প্রবন্ধ পাঠ ক'রে, রামমোহন দেখলেন, ঐ প্রবন্ধটা সারবান নয়। তিনি সেই প্রবন্ধে পরিদৃষ্ট নানারূপ কু-যুক্তির বিরুদ্ধে একখানি প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করলেন—সেই পত্রিকাতেই। কিন্তু "সমাচার-চন্দ্রিকা" সেই পত্র প্রকাশিত করার উদারতা প্রদর্শন করল না। রামমোহন তখন প্রকাশ করলেন "ব্রাহ্মণসেবধি" (Brahmanical Magazine) নামক একখানি পত্রিকা। সেই পত্রিকায় খৃস্টধর্মের মূল্যবান বাণীগুলি প্রচারিত হল এবং হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে খ্রীস্টান পাদ্রীদের ভ্রম প্রদর্শিত হ'ল।

মানুষের মঙ্গলের জন্য ভগবান নানাসময়ে নানারূপ ধারণ করেন, এ অভিমত সুপ্রচলিত। ভগবান কর্তৃক মৎস্যরূপ, কূর্মরূপ, বরাহরূপ প্রভৃতি দশটি রূপ ধারণের কথা হিন্দুদের পবিত্র পুরাণ-গ্রন্থে উক্ত হয়েছে। সেই সম্বন্ধে বাঙ্গালী মহাকবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় দশাবতারস্তোত্র রচনা করেছেন। জয়দেবের সেই পদ্য যেন একটি মধুময় পদ্ম। পদ্মোপম সেই পদ্যটি কণ্ঠস্থ ক'রে আবৃত্তি করার যোগ্য। ভগবানের মৎস্য অবতার সম্বন্ধে জয়দেব বলেন ঃ

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্'
বিহিত বহিত্রচরিত্রম খেদম্।
কেশব ধৃত মীন শরীর,
জয় জগদীশ হরে ॥

—হে কেশব, হে মৎস্যদেহধারী, হে জগদীশ, হে হরি। প্রলয়কালে তিনখানি বেদ সিন্ধু-গর্ভে নিমগ্ন হয়েছিল। তখন তুমিই মৎস্যরূপ ধারণ ক'রে নৌকার মতো সম্যকরূপে বেদের রক্ষাবিধান করেছিলে। তুমি জয়যুক্ত হও।

কিন্তু পাদ্রী ঐ মৎস্য-কূর্ম-বরাহ সম্বন্ধে উপহাস করেছিলেন। স্বধর্মনিষ্ঠ রামমোহন ঐ উপহাসের বিরুদ্ধে শান্ত-সংযত ভাবে প্রতিবাদবাণী উচ্চারণ করলেন। তিনি খ্রীস্টীয় ধর্মগ্রন্থ হতেই প্রদর্শন করলেন, হোলি গোষ্ট (Holy Ghost) ঈশ্বর হয়েও মানুষকে বিনয় ইত্যাদি নানারূপ সৎভাব শিক্ষাদানের জন্য কপোতরূপ ধারণ করেন নি কি? ঈশ্বর যদি কতোপরূপ ধারণ করেন, আর সে ব্যাপারটি যদি উপহাসের বিষয় না হয়, তা হ'লে ভগবানের মৎস্য-কূর্ম-বরাহরূপ ধারণ উপহাসের বিষয় হবে কোন্ যুক্তি বলে?

যে করেছিল উপহাস, মোহন রামমোহনের ঐ যুক্তির জোরে সে যেন হয়ে গেল তুচ্ছ পাতিহাঁস।

পবিত্রচেতা রামমোহন পৃথিবীতে প্রচলিত সমুদয় ধর্মশাস্ত্র-সিন্ধুতেই অবগাহন করেছিলেন। তাঁর হৃদয়-দেশে বিদ্বেষ-বিষ লেশমাত্রও ছিল না। Precepts of Jesus, the Guide to

Peace and Happiness; An appeal to the Chr!stan Public, Second Appeal to the Christan Public Appeal :—এ সব পুস্তক-পুস্তিকা রামমোহনই প্রকাশ করেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে মার্শম্যান সাহেবের সঙ্গে রামমোহনের বিচার হয়েছিল। সেই বিচারে রামমোহন রায় হিব্রু ভাষায় বিরচিত বাইবেল গ্রন্থ হতে নানারূপ বাণী উদ্ধৃত ক'রে মার্শম্যানকে একটা জবর মার দিয়েছিলেন। —পরাভূত ক'রে যেন ভূত ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলেন—রসিকতা ক'রে এরূপও বলা হয়। অহিন্দুরাও তখন পেয়েছিলেন রামমোহনের প্রতিভার পরিচয়।

তখন "ইণ্ডিয়া গেজেট" নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন একজন ইংরাজ। রামমোহনের মনীষা ও বিচারদক্ষতা দর্শন ক'রে তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি তখন অভিমত প্রকাশ করলেন, এই বিরাট ভারতবর্ষে রামমোহনের তুল্য বিরাট ব্যক্তি আর দেখা যায় না।

খৃস্টান ধর্মযাজকের মত পরিবর্তন : ঐ সময়ে একজন যুবা ধর্মযাজক ইংলণ্ড হতে ভারতে আগমন করেন। তাঁর নাম উইলিয়াম অ্যাডাম। শ্রীরামপুরস্থ খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ তাঁর উপর রামমোহনের সঙ্গে সমগ্র বাইবেলের বঙ্গানুবাদের কার্যের ভার অর্পণ করলেন। রামমোহন তাঁর মনীষা বলে অ্যাডামকে বুঝিয়ে দেন, যে খৃস্টীয় ধর্মশাস্ত্রোক্ত ত্রিত্ববাদ ভ্রমহীন মতবাদ নয়। অ্যাডাম তখন ত্রিত্ববাদ প্রত্যাখান করেন, এবং একেশ্বর বাদে পূর্ণ আস্থাশীল হন। তখন খৃস্টানেরা অ্যাডামের উপর ক্রুদ্ধ হলেন; রামমোহনের উপরও ক্রুদ্ধ হলেন।

খ্রীষ্টীয় বাইবেলে উক্ত হয়েছে, যে বিশ্বের প্রথম মানব অ্যাডাম শয়তানের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের একটি আদেশ লঙ্ঘন করেন, এবং তার ফলে পাপী হয়ে পড়েন। ঐরূপে, খৃস্টানদেরও অভিমত প্রকাশ পেতে লাগল, যে রামমোহন রায়ের অসৎ প্রভাবে প'ড়ে অ্যাডামের পতন হ'ল। তাঁদের মতে, এটা হ'ল "Second fall

of Adam" !—খৃষ্টানরা যথার্থ খৃষ্টান অ্যাডামকে ঐ ব'ল উপহাস করতে লাগলেন।

রামদাস কে ?ঃ তৎকালে ডক্টর টাইলর নামক এক খৃষ্টান যুবক ছিলেন হিন্দুকলেজের অধ্যাপক এবং মেডিকেল কলেজের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সমর্থন ক'রে "হর্‌করা" পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রচার করলেন। রামমোহন তখন এক ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন। সে নামটি হচ্ছে "রামদাস"। রামদাস লিখলেন—রামমোহন রায় হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সমর্থন করেন না; খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদও সমর্থন করেন না। সুতরাং আমাদের একত্র হয়ে রাম-মোহনকে আক্রমণ করাই সংগত বটে।

ঐ সময়ে ডক্টর টাইলর এবং আরও কয়েকজন খৃষ্টান খৃষ্টধর্মের গৌরবই সর্বাধিক ব'লে ঘোষণা ক'রে নানারূপ প্রবন্ধ প্রচার করতে লাগলেন। রামমোহনও 'রামদাস' ছদ্মনামে লেখনী পরিচালনা ক'রে, তার অকাট্য যুক্তি রাশি প্রদর্শন করতে লাগলেন। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে অ-খৃষ্টান রামমোহনের অসামান্য পাণ্ডিত্য দর্শনে, লোকে তাঁকে বলতে লাগল অদীক্ষিত খৃষ্টান ধর্মযাজক। রামমোহনের সঙ্গে সেই বিচারে, তাঁর প্রতিপক্ষ আছাড় খেয়েছিলেন—পরাভূত হয়েছিলেন।

তখন শ্রীরামপুরে ছিল খৃষ্টানদের মুদ্রাযন্ত্র। রামমোহনের পুস্তক-পুস্তিকা সেখানেই মুদ্রিত হ'ত। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, সেই মুদ্রাযন্ত্রে পুস্তক মুদ্রনের সুবিধা রামমোহনকে আর প্রদত্ত হ'ল না। রামমোহন তখন কলিকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটে "ইউনিটেরিয়া প্রেস" নাম দিয়ে একটি মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠিত করলেন।—সেটি তাঁর পক্ষে ভালোই হ'ল—অশুভ হ'তে শুভই সঞ্জাত হ'ল।

অ্যাডামের শরণ রামমোহনঃ উইলিয়াম অ্যাডাম ত্রিত্ববাদ বর্জন করায় এবং একেশ্বরবাদে আস্থা স্থাপন করায়, শ্রীরামপুরস্থ পাদ্রীগণ তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করলেন, সম্বন্ধ আর রাখলেন না।

রামমোহন তখন কি করলেন? অ্যাডামের সর্বপ্রকার ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করলেন। তিনি অ্যাডামকে সহযোগী ক'রে Unitarian Mission প্রতিষ্ঠা করলেন! ঐটি হ'ল একেশ্বরবাদ গ্রহণকারীদের উপাসনা সভা। সেই সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত প্রতি রবিবার, হরকরা পত্রিকার অফিস ভবনের একটি অংশে। সেখানে উপাসনা হত একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদের পদ্ধতি অনুসারে! রামমোহন সপরিবারে যোগদান করতেন। তাঁর বন্ধুরাও যোগদান করতেন।

ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের মনোভাব কত উদার ছিল, ঐটি তার অন্যতম প্রমাণ নয় কি?

অ-মুসলমান রামমোহন মুসলিম ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পাণ্ডিত্যে কোন মুসলমান অপেক্ষা কম ছিলেন না। তাই মৌলবীরাই তাঁকে বলতেন "জবরদস্ত মৌলবী"।

অদীক্ষিত খৃষ্টান এবং জবরদস্ত মৌলবী ব'লে রামমোহনের যে অ্যাখ্যা, তার বলে তিনি খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদেরও পরম আপন জন ব'লে গণ্য হতে পারেন না কি?

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবাদী রামমোহন: ব্রাহ্মসমাজ কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ল?

একদিন, একেশ্বরবাদীদের প্রার্থনা সভা সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। রামমোহন স্বীয় বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করছেন। সঙ্গে রয়েছেন চন্দ্রশেখর দেব এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী মহাশয়দ্বয়। তাঁরা তখন রামমোহনকে বললেন, ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আমরা গমন করছি বিদেশীয়দের উপাসনা-ভবনে।—এই পরাধীনতা কি ভালো?—আমাদের নিজেদের কি একটি উপাসনা ভবন হতে পারে না?

রামমোহন তখনই ব'লে উঠলেন, পারে, নিশ্চয়ই হতে পারে, এবং অবিলম্বেই তা হোক।

সেই অনুসারে ১৭৫০ শকাব্দের ৬ই ভাদ্র, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ২০ তারিখে, চিৎপুরে এক ভদ্রমহোদয়ের ভবনে

উপাসনা সমাজ সংস্থাপিত হ'ল। কালীনাথ মুন্সী, দ্বাকানাথ ঠাকুর এবং ধর্মপথানুবর্তী আরও কয়েকজনে ঐ পবিত্র কার্যে সাহায্যদান করলেন। উপাসনা-সমাজের সম্পাদক হলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী মহোদয়।

প্রতি শনিবারে অনুষ্ঠিত সেই ধর্মসভায় বেদ এবং উপনিষদ পঠিত হত। দক্ষিণ ভারতের সুপণ্ডিত দুইজন তেলেগু ব্রাহ্মণ এবং বাঙ্গালী মনীষী উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ সেই পবিত্র পাঠকার্য সম্পাদন করতেন। পাঠের পর, বেদ ও উপনিষদের শ্লোক রাশির সুচারু ব্যাখ্যা বিঘোষিত হত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কণ্ঠ হতে। প্রার্থনা সভা শেষ হওয়ার পূর্বে ধর্মসংগীত গীত হয়ে সভাস্থ সকলের হৃদয় যেন এক পবিত্র লোকে নীত হত।

পরে সমাজ-মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ লাভ হয়, কলিকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে ভূমি ক্রয় করা হয় এবং সেখানে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির সংস্থাপিত হয়।

নবনির্মিত ভবনে কোন্ পবিত্র দিনটিতে ঐ ধর্মসমাজের কার্য আরম্ভ হয়েছিল? আরম্ভ হয়েছিল ১১ই মাঘ তারিখে ১৭৪১ শকাব্দে।

সেদিন কোন্ ব্রহ্মনিষ্ঠ মানুষ আচার্যের কার্য করেছিলেন?

সেদিন যিনি আচার্যের কাজ করেছিলেন সেই ভক্তের নাম হচ্ছে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

উপাসনার সেই উত্তম লগ্নে বহু ব্যক্তি সেখানে সমাসীন ছিলেন। সেই পবিত্র ধর্মোৎসব উপলক্ষে বিত্তবান ব্যক্তি প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং আরও কেহ কেহ বিপ্রগণকে ধন দান করেছিলেন।

প্রীতিবাদ ও প্রতিবাদ ঃ রামমোহন তাঁর সাধুকর্মের জন্য বহু মানুষের প্রীতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, বর্তমানেও প্রাপ্ত হচ্ছেন, ভাবী-কালেও প্রাপ্ত হবেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনি, বোধ হয়, এখন আর কোথাও জাগে না। কিন্তু সেই যুগে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের

বন্যা হয়েছিল অতি প্রবল।—সেই নূতন সংস্কার লাভ করেছিল সুতীক্ষ্ণ তিরস্কার।

ব্রাহ্মসমাজ মন্দির সংস্থাপিত হওয়ার ছয় দিন পূর্বে স্থাপিত হ'ল একটি "ধর্মসভা"। সেটিও হল জোড়াসাঁকো অঞ্চলে। 'ধর্মসভা'র ধন-বলও হ'ল অধিক।

কাদের দ্বারা সেই ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হল?

সেই ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হল রামমোহনের ধর্মমতের বিরোধীদের দ্বারা।

তৎকালে কলিকাতার শোভাবাজারের শোভাস্বরূপ ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। তিনি ঐ ধর্মসভার সভাপতি।

ধর্মসভার সম্পাদক হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেক শিষ্ট ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সভায় যোগদান করলেন। তাঁদের মধ্যে, রামকমল সেন এবং মতিলাল শীল প্রভৃতিও ছিলেন।

ধর্মসভার অভিমতের প্রচারক হ'ল "সমাচার চন্দ্রিকা" নামক পত্রিকা। রামমোহনের পত্রিকা ছিল "সংবাদ কৌমুদী"।

এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, "সমাচার চন্দ্রিকা", এবং "সংবাদ কৌমুদী" কথার অর্থের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। উভয়ের লক্ষ্য ছিল ধর্ম। পার্থক্য ছিল শুধু মত ও পথ সম্বন্ধে।

কালিকাক্ষেত্র কলিকাতার হিন্দুসমাজে তখন দুইটি দল। দুই দলের দুই নেতা, রামমোহন এবং রাধাকান্ত।

দেশের মধ্যে একাধিক দল দেশকে দলন করে—দেশের স্বার্থকে আর্ত ক'রে ফেলে,—এ যুক্তি সারবান কিনা তা চিন্তা ক'রে দেখা যেতে পারে।

"সমাচার চন্দ্রিকা" পত্রিকা প্রচার করতে লাগল, যে রামমোহনের ধর্মমত প্রকৃতপক্ষে অধর্মমত।

ঐ অভিমতের প্রতিবাদ, "সংবাদ কৌমুদী" যা প্রচার করতে লাগল, তার কথা হচ্ছে।

থেকো না কেউ চক্ষু মুদি;
লাভ করো সম্বোধি।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর, ধর্মজ্ঞান লাভ কর,—নির্ভীক ধার্মিক হও।

"ধর্মসভার" সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করতে লাগলেন। ব্রাহ্মসমাজ এবং রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে তিনি লোকের নিকট যা বলতে লাগলেন, তা হ'ল বোলতার দংশনের মতো।—নিন্দাবাদের উদ্যোগে ভবানীচরণ যেন হয়ে পড়লেন নিদ্রাহীন।

তখন সর্বত্রই হিন্দুসমাজের ঐ দুইটি দল সম্বন্ধে বিপুল আলোচনা। মোহন রামমোহনকে দমন করার দিকেই অনেকের মন। রামমোহনের বিরুদ্ধে ছড়ার ছড়াছড়ি। একটা ছড়ার কিয়দংশের নিদর্শন এখানে প্রদর্শন করা গেল :

"সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মুল,
'ওঁ তৎসৎ' ব'লে বেটা বানিয়েছে স্কুল ;
ও সে জেতের দফা
করলে রফা,
মজালে তিন কুল।

অনেক লঘুচেতারা মনে করত, ঐ ছড়া রসবড়া।

তখন ধর্মধ্বজাধারী রামমোহনের বিরুদ্ধে কেবলমত্রে ছড়াই হ'ল না। প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁকে হত্যা ক'রে তাঁর সত্তা বিলুপ্ত ক'রে দেওয়ার অভিসন্ধিও নাকি করল

তথাপি, রামমোহনের পক্ষ অবলম্বনের মনোভাবেরও অভাব দেখা গেল না। জোড়াসাঁকোর সিংহ মহাশয়েরা, ঠাকুর মহাশয়েরা মনের জোর দেখিয়ে রামমোহনের পক্ষের প্রতি সখ্য প্রদর্শন করলেন ; তেলেনীপাড়া নামক স্থানের অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গার পশ্চিম উপকূলের অধিবাসী মল্লিক মহোদয়গণ, টাকীর কালীনাথ মুন্সী মহাশয় এবং আরো কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজ এবং রামমোহনের মহিমা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেন না।

ধন্য রামমোহনের ধর্মান্দোলন।···এরূপ।···এরূপ ধ্বনিও জাগ্রত হ'ল ধনীদের মধ্যে, জাগ্রত হ'ল দরিদ্রের মধ্যে।

ব্রাহ্মসমাজ মন্দির মধ্যে অনুষ্ঠিত ধর্মকার্যে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করতে পারেন। মর্মে ধর্ম থাকাই হচ্ছে আসল বিষয়।

নারীকুলের মঙ্গল ব্রতে ব্রতী রামমোহন

॥ দুঃসহ সতীদাহ ॥

সতীদাহ···দুঃসহ সতীদাহ।

সতীদাহ আসলে সতীদাহ নয়। সতীদাহ আসলে ছিল সমাজ-দাহ। সতীদাহ কুপ্রথা রহিত করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেছিলেন রামমোহন।

একদিন নদীতীরে একস্থানে এক চিতা জ্বলছে : এক ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে দণ্ডায়মান; সতীকে বলপূর্বক চিতায় দগ্ধ করা না হয়, সেজন্য সিপাহী দণ্ডায়মান; কিছু সংখ্যক লোক দণ্ডায়মান। সুসজ্জিতা এক নারী···এক সতী চিতার অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করলেন।···সেই প্রবেশ মৃত্যুর মুখ মধ্যে প্রবেশ। চিতার অগ্নি মানুষের সেই ভঙ্গীকে গ্রাস করল। তৎক্ষণাৎ, ত্রাস বশে সেই সতী চিতা হতে লম্ফ প্রদান করলেন। তাঁর কণ্ঠে আর্তনাদ বেজে উঠল, ত্রাহি! ত্রাহি—আর তৎক্ষণাৎ সেই সিপাহী তার অসি উদ্যত করল—আঘাত করতে চাইল সতীকে। সিপাহী তার কর্তব্য সম্পাদন ক'রে, অকর্তব্যই করল। সেই নারী তখন অর্ধদগ্ধা। সিপাহীর অসীর আঘাতের ভয়ে, তিনি আবার প্রবেশ করলেন চিতায়। ম্যাজিস্ট্রেট তখন সিপাহীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন, স'রে যাও, দূরে যাও। সতী নারী আবার চিতাগ্নি হতে বেরিয়ে এলেন। প্রাণ বাঁচাবেন ব'লে লম্ফ দিয়ে পড়লেন নদীর জলে। সতীর আত্মীয়রা সতীকে ধ'রে ফেলল—জীবন রক্ষার চেষ্টায় বঞ্চিত করল। সতী তখন প্রকৃতপক্ষে উন্মাদবৎ। তিনি আবার চিতাগ্নিতে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু বিদেশী

ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে সে কার্য করতে দিলেন না। তিনি সতী নারীকে প্রেরণ করলেন চিকিৎসালয়ে।

ঐ কাহিনী মোটেই মিথ্যা নয়। ইংরাজ নারী ফ্যানি পার্কস ঐ ঘোর ঘটনা দর্শন করে পরে লিপিবদ্ধ করেন।

ঐ! আর একদিন আর এক যায়গায় এক চিতাগ্নি। অগ্নির ধূম্ররাশি উঠছে। নানারূপ বাদ্য বাজছে। লোকের কলরব, কোলাহল। চিতার নিকটে অবস্থিতা সতী নারী দেখলেন ঐ অবস্থায় তাঁর জীবন রক্ষা করার একটা সুযোগ। তিনি পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করলেন। একটু পরেই তাঁর আত্মীয়রা দেখল তারা যাঁকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ হতে দেখতে চায়, তিনি সেখানে নেই। তখনই তারা ঢুকল জঙ্গলে। সতীকে ধরে ফেলল। বের ক'রে আনল। একটা নৌকায় তাকে তুলল। নদীতে ডুবিয়ে দিল।

সে দিন তারা কি সমগ্র সমাজকেই ডুবিয়ে দিল না?

ঐ ঘোর ঘটনাও কল্পিত নয়। একজন ইংরাজ নারীর সত্য বর্ণনা।

কলিকাতায় ১৮১৫ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮২৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বৎসর কয়টিতে কতজন সতী চিতাগ্নিতে ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন? যথাক্রমে ২৪৩, ২৮৯, ৪৪২, ৫৪৪, ৪২১, ৩৭০, ৩৯২, ৩২৮, ৩৭৩, ৩৯৮, ৩২৪, ৩৩৭ জন। ভারতের অন্যত্রও ঐরূপ ঘোর ঘটনা ঘটত।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের এক পত্নীও ঐরূপে সহমৃতা হয়েছিলেন।

ভারতে সতীদাহ প্রথা ছিল সুপ্রাচীন। ভারতশত্রু আলকসণ্ড্রস, যাঁকে এদেশে বলা হয় আলেকজাণ্ডার তাঁর ভারত আক্রমণকালেও ভারতে ঐ পাপপ্রথা পরিদৃষ্ট হয়েছে। ভারতের কোন কোন মুসলমান বাদশা এবং এদেশে আগত পর্তুগীজ-দিনেমার-ফরাসীরা ঐ প্রথা বিলুপ্ত করার চেষ্টা করেন। রামমোহনের নিতান্ত শৈশবকালেও এদেশের তখনকার ইংরাজ সরকার ঐ বিষয়ে চেষ্টাশীল ছিলেন।

এক কাপ্তেন ছিলেন। তাঁর নাম টমিন। তিনি সহমরণ প্রথার মরণ ঘটানোর চেষ্টা করেন। তার ফলে, তাঁরই মরণ সংঘটনের চেষ্টাও হয়েছিল। জে. আর. এলফিন ষ্টোন লর্ড ওয়েলেসলীর নিকট একবার এক পত্র প্রেরণ করেছিলেন ঐ প্রথা রহিত করার জন্য। ঐ সময়ে সুপণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা ঐ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের অভিমত প্রকাশ করেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে দেখা যায়, কয়েকটি সন্তানের জননী, গর্ভবতী নারী এবং বারো বৎসর বয়স্কা বিধবা ঐ পাপ প্রথার কবল থেকে আইন বলে বেঁচে যেতে পারেন।

একদা এই দেশের একদল লোক সতীদাহ প্রথার বিপক্ষে, এবং আর একদল লোক ঐ প্রথার সপক্ষে দুইখানি আবেদন পত্র মার্কুইস অব হেস্টিংসের নিকট প্রেরণ করেন। হুগলীর এক জেলা শাসকের নাম ছিল অক্‌লে। তিনি হেস্টিংসকে জানিয়েছিলেন, সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হ'লে সতীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়তো আপত্তি উত্থাপন করতে পারে। অন্য কেহ আপত্তি করবে ব'ল বোধ হয় না।

সতীদাহ প্রথা রহিত করার চেষ্টা হচ্ছিল এবং হতে লাগল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে একটি সরকারী আদেশ প্রচলিত হল: কোন নারী যদি সহমৃতা হতে ইচ্ছা করেন, তা হ'লে, সহমৃতা হওয়ার পূর্বে, কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মীর অনুমতি গ্রহণ করতেই হবে।

ঐ আদেশ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু সমাজের নানাক্ষেত্র থেকে ধ্বনি উঠল: ঐ বিধির বলে হবে না দেশের হিত। এ বিধি করা হোক রহিত।

এরূপ আবেদনপত্রও রাজ্যসরকারের নিকট প্রেরণ করা হ'ল।

রামমোহন তখন কি করলেন? উক্ত আবেদনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করলেন। ইংরাজ সরকারের প্রশংসা ক'রে, পত্র প্রেরণ করলেন তখনকার ইংরাজ গভর্ণর-জেনারেলের নিকট।

রামমোহন সতীদাহ প্রথা চিরতরে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করতে সর্বদাই সজাগ ছিলেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য তিনি শ্মশানে

গমন করতেন। সতীকে বলতেন, সতী! তোমার এ দুর্গতি কেন, মা? নিরস্ত হও, নিরস্ত হও! পাপ প্রথা পদদলিত কর।

সতীদাহের অনিষ্টকারিতা এবং এ প্রথা রহিত করার হিত বর্ণনা ক'রে রামমোহন রায় বঙ্গভাষায় এবং ইংরাজী ভাষায় পুস্তক রচনা ক'রে বিতরণ করেছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত হ'ল রামমোহনের রচিত সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ; ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল রামমোহন-রচিত 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'। 'প্রবর্তক' বলছেন সতীদাহ প্রথা সমর্থন ক'রে; 'নিবর্তক' বলছেন সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা ক'রে;—দুইজনের এরূপ কথোপকথনে পুস্তক পরিপূর্ণ।

"ইণ্ডিয়া গেজেট" পত্রিকা রামমোহনের এ সকল পুস্তকের প্রশংসা করেছিল।

রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র দ্বারাই প্রমাণিত করেছিলেন, যে সতীদাহ প্রথা সুপ্রথা নয়, কুপ্রথা।

দায়াধিকার সম্বন্ধে—অর্থাৎ, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে—হিন্দুদের শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা রয়েছে, সে ব্যবস্থা ইয়োরোপের ব্যবস্থা শাস্ত্র অপেক্ষা উত্তম, রামমোহন এটিও প্রমাণিত করতে চেষ্টাশীল ছিলেন।

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এদেশে যখন ন্যায় বুদ্ধি জাগ্রত হয়ে উঠল, সেই সময়ে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের বহু সদস্যও ঐ প্রথার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

সতীদাহ প্রথা অপ্রচলিত করার উদ্দেশ্যে ভারতের ইংরাজ শাসক লর্ড আমহার্স্ট্ যে বিধি প্রচার করলেন, সে হচ্ছে এইরূপ : যে বিধবা তাঁর স্বামীর শবের সঙ্গে দগ্ধ হয়ে জীবন বিসর্জন করতে চাইবেন, তাঁকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ব্যতীত আলাদা ভাবে দগ্ধ করা চলবে না; অথবা অন্য কোনরূপেও তাঁকে নিহত করা চলবে না। সহমৃতা হতে ইচ্ছুক নারীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অন্যে তাঁর পক্ষ হয়ে অনুমতি গ্রহণ করলে

চলবে না। যারা বিধবার সহমরণে কোনরূপ অনুকূল্য করবে, তারা সরকারের অধীনে কোন চাকরি প্রাপ্তির যোগ্য হবে না। যিনি সহমৃতা হবেন, তাঁর স্বামীর যদি কোন বিত্ত-সম্পত্তি থাকে, সে সব সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য হয়ে যাবে।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক যখন ভারতের বড়লাট হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে রামমোহনের সাক্ষাৎ হ'ল। রামমোহন রায় বেণ্টিঙ্ককে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হলেন, যে সতীদাহপ্রথা হিন্দুসমাজের পক্ষে একটা ঘোর অন্যায় কর্ম।

রামমোহনের সেই মহৎ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হ'ল। ১৮২৯ খৃস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর দিবসে ইংরাজ বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক আইন বলে সতীদাহ প্রথা রহিত করেছিলেন। সেই দিন একটি দিন বটে।

এইবার সতীদাহ প্রথার সমর্থকেরা ঐ আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডস্থ প্রীভিকাউন্সিলের নিকট আবেদন করলেন। কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য হ'ল না।

সতীদাহ প্রথা আইন বলে রহিত হয়ে যাওয়ার পর রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এক সঙ্গে মিলিত হয়ে উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। কলিকাতা টাউন হলে সেই অভিনন্দন সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। বাংলা এবং ইংরাজী ভাষায় রচিত অভিনন্দন পত্র পঠিত হল।

এত দিন ছিল সতীর দুর্গতি। রামমোহনের চেষ্টায়, হল সতীর সুগতি।

বাল্য বিবাহের বিরোধিতা : কোন্ কোন্ সংস্কৃত পুস্তক হিন্দুশাস্ত্র ব'লে অভিহিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে, হয়তো যথেষ্ট বিচার ক'রে দেখা হয় না। দেখা হয় না ব'লেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু পুস্তককে হিন্দুশাস্ত্র ব'লে অভিহিত করা হয়, এবং হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কোন সময়ে কটূক্তি করা হয়। যে সকল পুস্তক হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ বলে

অভিহিত হওয়া উচিত ; সে সকল পুস্তকে মানুষের হিতজনক অনেক কথাই রয়েছে।

হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে, যেখানে নারী সম্মান প্রাপ্ত হন, সেখানে দেবতারা আনন্দ লাভ করেন।

নারীকে সুশিক্ষা দান করার উপদেশও হিন্দুশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশকে হয় তো, হৃদয়দেশে তেমন স্থান দেওয়া হয়নি। সেইজন্যই বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, কন্যাপণ, বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হওয়া ইত্যাদি ব্যাপার যথেষ্টই দেখা গিয়েছে।

পুরুষ কিংবা নারীর বাল্যবিবাহ রামমোহন সমর্থন করতেন না। কারণ বাল্যবিবাহ সমাজের পক্ষে এক শল্য—অনিষ্টকারক।

বাল্যকাল বিদ্যাশিক্ষা এবং অন্যরূপ প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের কাল। তখন যদি বিবাহ হয়ে যায়, তা হলে, নানারূপ প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ নিশ্চয়ই ব্যাহত হয় এবং তার ফলে জীবনের নানারূপ শক্তিও বিনষ্ট হয়।

বহুবিবাহের বিরোধিতা : পুরুষের বহুবিবাহ জীবনকে প্রকৃত-পক্ষে সুসহ করে না, করে দুঃসহ। নানারূপ অনাচার ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি ঐ ব্যাপার থেকেই হয়ে থাকে। বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও নানারূপ সংকট এ থেকেই উদ্ভূত হয়।

রামমোহন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বহুবার বহু যুক্তিযুক্ত অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

কন্যাপণ প্রথার বিরোধিতা : পাত্র পক্ষের নিকট হতে অর্থ-গ্রহণ ক'রে, পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দান কি আসলে 'দান' বলে অভিহিত হতে পারে? কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার পূর্বে কেন যে পাত্রের নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করা হবে, তার কি যুক্তিসংগত কোন কারণ আছে? কন্যাপণ প্রথার সুযোগে, বিকলাঙ্গ পুরুষের বিবাহ

হয়, রুগ্ন পুরুষের বিবাহ হয়, বৃদ্ধের বিবাহ হয়, নানারূপ দোষ-দুষ্ট নরের বিবাহ হয় এবং তার ফল হয় বিষময়।

রামমোহন কন্যাপণ প্রথাকেও প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলেন। নবদ্বীপের কোন বিখ্যাত জমিদার নিয়ম করেছিলেন, যে তাঁর জমিদারীর মধ্যে কন্যাপণ প্রথা কিছুতেই প্রচলিত থাকবে না। রামমোহনের আন্দোলনে সেই জমিদারকে আনন্দ দান করেছিল ব'লেই, তিনি এরূপ করেছিলেন।

রামমোহন কৌলীন্যপ্রথা কালগর্ভে বিলীন করার একান্তই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, কৌলীন্য সমাজকে করে ক্লিন্ন।

বিধবা বিবাহ সমর্থন : রামমোহন সতীদাহ প্রথা অবলুপ্ত করার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। তাই এইটিই স্বাভাবিক, যে তিনি বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন।

রামমোহনের সম্পাদনায় "সম্বাদকৌমুদী" পত্রিকায় প্রকাশিত হত। "সম্বাদকৌমুদী"র ষষ্ঠ সংখ্যায় রামমোহন হিন্দুদের নিকট একটি প্রশংসনীয় প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, হিন্দু-বিধবাদের দুঃখ দূরীকরণের জন্য একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হোক। —বিগত হোক হিন্দুবিধবাদের সর্ব দুঃখ শোক।

জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা : জাতিভেদ সমাজের সংহতি করে ভেদ। তার ফলে, সমাজ প্রাপ্ত হয় খেদ।

মহান রামমোহন জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর একখানি পত্রে এ সম্বন্ধে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা থেকে বলা যায় হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা বর্তমান থাকার ফলে হিন্দু দুঃখ সিন্ধুতে পতিত হয়েছে ; বহুবার চলে গিয়েছে তার স্বাধীনতা, তার উপর চেপে রয়েছে পরাধীনতা।

জাতিভেদ প্রথা থাকার ফলেই, হিন্দু হিন্দুকে ভাই বলে গণ্য করতে পারে নি। বক্ষে ঠাঁই দিতে পারে নি। তার ফল হয়েছে অশ্রুজল।

জাতিভেদ প্রথা না থাকুক, হিন্দু এক মন, এক প্রাণ হয়ে জেগে উঠুক, এই ছিল রামমোহনের অভিপ্রেত।

মুসলিম শাস্ত্রের প্রতি রামমোহনের প্রীতি: রামমোহনের আবির্ভাবের যুগে ভারতে মুসলিম প্রভাব ছিল সুবিপুল। তাই তিনি অল্প বয়সেই পাটনায় প্রেরিত হন। সেখানে আরবী ও পার্শী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। 'কোরাণ' উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন।

রামমোহন একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। এ বিষয়ে তিনি মুসলিম শাস্ত্রের প্রভাব যথেষ্টই প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এরূপ বলা হয়।

একটি মুসলমান ধার্মিক সম্প্রদায়ের নাম হচ্ছে 'সুফী সম্প্রদায়'। ভারতের বেদান্তশাস্ত্রের মতের সঙ্গে সুফীদের মতের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। সুফীদের বিরচিত গ্রন্থাদি রামমোহনের অতিশয় প্রিয় ছিল।

মুসলমানদের মহান ধর্মগুরু হজরত মহম্মদের প্রতি রামমোহন ছিলেন অতিশয় শ্রদ্ধাশীল। তিনি নাকি হজরত মহম্মদের একখানি জীবনী গ্রন্থ রচনার কার্যেও লেখনী ধারণ করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সে গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হয়নি।

আরবী ভাষার কবিতা এবং পার্শী ভাষার কবিতা রামমোহনের ছিল সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী। তিনি প্রত্যহ স্নান কালে সেই সব কবিতা আবৃত্তি করতেন।—সেই কবিতা-সলিলেই যেন স্নান করতেন।

মুসলমানেরা রামমোহনকে বলতেন 'জবরদস্ত মৌলবী'। সেই থেকেই জানা যায় এবং বুঝা যায়, মুসলমানেরা রামমোহনের প্রতি প্রীতি করতেন; তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন।

রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে রামমোহন: প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাজাই সত্যযুগের প্রবর্তক। আবার, রাজাই হন কলি-যুগের প্রবর্তক।

ঐ কথার তাৎপর্য্য হচ্ছে: রাষ্ট্রসরকারের কর্মের ফলে দেশ উন্নত হয়। আবার রাষ্ট্র সরকারের কর্মের ফলে দেশ অধঃপতিত

হয়। দেশের সরকার যদি নানারূপ উত্তম কর্ম সম্পাদন করেন এবং দেশস্থ লোকদের দ্বারা করিয়ে নেন, তা হ'লে দেহের মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয়। দেশের সরকার যদি উত্তম কর্ম না করেন এবং দেশের লোককে দিয়ে করিয়ে নিতে না পারেন, তা হলে, দেশের অমঙ্গল হয়।

প্রাচীন কালে প্রকাশিত ঐ অভিমত বর্ত্তমান কালেও সম্পূর্ণ রূপেই সত্য ব'লে গণ্য করা হয়।

সুপ্রসিদ্ধ মনু-সংহিতা গ্রন্থে উক্ত হয়েছ ঃ

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্বতোদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥

ঐ বাক্যের সোজা অর্থ হচ্ছে—রাষ্ট্রে যদি সরকার না থাকে—সুকর্ম সম্পাদনক্ষম সরকার না থাকে—তা হলে, রাষ্ট্রস্থ সকলেই ভীতিবশে ব্যাকুল হয়। এই কারণে, রাষ্ট্র রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র-কর্তা থাকা প্রয়োজন হয়েছে।

রাজনীতি মানুষের পক্ষে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঐ সকল উক্তি হতে তা উপলব্ধি হয়। রসিকতা-বশে বলা যায় বটে Politics is nothing but Polytricks, কিন্তু প্রকৃপক্ষে, রাজনীতি অতি পবিত্রনীতি—মানুষের যথার্থ মানুষরূপে বিরাজ করার পক্ষে অত্যধিক প্রয়োজনীয় যে নীতি, সেই নীতিই হচ্ছে রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি।

রাজা রামমোহন রায় রাজনীতি বা বাষ্ট্রনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ আগ্রহশীল ছিলেন। এ বিষয়ের প্রমাণ প্রচুর বিদ্যমান।

রামমোহন তাঁর ষোড়শবর্শ বয়ঃক্রম কালে ভারত ত্যাগ করে সুদূর দেশে গমন করে ছিলেন। ভারতের তখনকার বিদেশী শাসনের প্রতি বিরূপ হয়েই তিনি সেই কর্ম ক'রেছিলেন, এরূপ বলা হয়। রামমোহনের লিখিত পত্রও হয়তো এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে।

যারা পরাধীন, তাদের আবার রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি কি ?—তাই রাজনীতির প্রসঙ্গে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এসেই পড়ে।

পরাধীন বা পরবশতা দুঃখপ্রদ। স্বাধীনতা বা আত্মবশতা সুখপ্রদ। আমাদের এই দেশে প্রাচীন কালেই এ কথা বলা হয়েছে।

মানুষের পক্ষে কবি হচ্ছেন হবি।—মানবের দেহের পক্ষে হবি যেরূপ হিতকর, মানুষের মনের পক্ষে কবিও সেইরূপ।

পরম শ্রদ্ধাভাজন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাব্যে বলেছেন :—

স্বাধীনতা হীনতায়
কে বাঁচিতে চায় হে.
কে বাঁচিতে চায় ?

দাসত্ব-শৃঙ্খল বল
কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?

বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে, কবি রজনীকান্ত সেন রজনীকান্তবৎ। রজনীকান্ত "স্বাধীনতার সুখ" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ কবিতা প্রচার করেছেন।

ইংরেজী ভাষায় বলা হয় : It is better to reign in hell than to serve in heaven—স্বর্গে দাসত্ব করা অপেক্ষা নরকে রাজত্ব করা ভালো।

রামমোহন রায় যে স্বাধীনতার অত্যন্তই পক্ষপাতী ছিলেন, বহু ঘটনায় সেটি প্রমাণিত হয়।

কোন পরাধীন জাতির স্বাধীনতা প্রাপ্তির সন্দেশ রামমোহনের নিকট বোধ হত যেন সন্দেশ !

রামমোহন একবার তাঁর কলিকাতাস্থ বাসভবনে তাঁর জন ষাটেক ইংরাজ বন্ধুকে ভোজদানে আপ্যায়িত করেছিলেন। কি উপলক্ষে সেই ভোজ প্রদত্ত হয়েছিল ? দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাস করছিলেন যে সব ঔপনিবেশিক স্পেনীয়ার্ড, তাঁরা বিদ্রোহ অভ্যুত্থান করেছিলেন, এবং জয়লাভ করেছিলেন। সেই সুসংবাদ শ্রুত হয়েই, দক্ষিণ আমেরিকা হতে বহু দূরস্থিত এই ভারতে অবস্থিত রামমোহন প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে ভোজ সম্পন্ন ক'রেছিলেন।

রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রীতির আর একটি দৃষ্টান্ত।

ইটালীর অন্তর্গত নেপল্‌স্-এর অধিবাসীরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির

জন্য সংগ্রাম করছিলেন। কিন্তু তাঁরা তখন জয়লাভ করতে পারলেন না, পরাজিত হলেন! সেই ব্যর্থতার বার্তা যে দিনটিতে কলিকাতায় এসে উপস্থিত হ'ল স্থিতধী পুরুষ রামমোহন সে দিন যেন একটা দারুণ শোক পেলেন। তাঁর ইংরাজ বন্ধু শ্রীবাক্‌ল্যাণ্ড-এর (অথবা, শ্রীবাকিংহাম-এর) ভবনে সে দিন ছিল রামমোহনের নিমন্ত্রণ। কিন্তু রামমোহন তথায় গমন করলেন না।

স্বাধীনতা সংগ্রামী নেপল্‌স্‌বাসীদের দিকে তখন রয়েছে তাঁর মন। তখন আনন্দ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তিনি কি ক'রে করবেন গমন?

আর একটি কাহিনী।

ভারত হতে রামমোহন রায় গমন করেছেন ইংলণ্ডে। জাহাজ যোগে যাচ্ছেন। জাহাজ উপস্থিত হ'ল নেটাল বন্দরে। রামমোহন তখন শ্রবণ করলেন, নেটাল বন্দরের সন্নিকটে রয়েছে ফরাসীদের অর্ণবযান। সেই অর্ণবযানে উড্ডীন হয়েছে স্বাধীনতার নিশান। তখন আনন্দভরে যেন নর্ত্তন করতে লাগল রামমোহনের প্রাণ। সেই নিশান দর্শন করবার জন্য তিনি তখনই হলেন প্রায় ধাবমান। অতি দ্রুত গমনের ফলে, রামমোহনের চরণ স্খলিত হ'ল। তিনি জাহাজের ডেকের উপর পতিত হলেন। তার ফলে, ভগ্নপদ হলেন—একখানি পা গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

"সম্বাদ-কৌমুদী" ভারতের হিতের জন্য রামমোহন একাধিক ক্ষেত্রে তাঁর লেখনী ধারণ করেছেন। রামমোহন ঐ পত্রিকাখানি সপ্তাহে একবার ক'রে প্রকাশিত করতেন।

বাংলা "সম্বাদ-কৌমুদী" পত্রিকা প্রথম কবে প্রকাশিত হয়েছিল? প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে। ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হ'ত প্রতি মঙ্গলবারে। আত্ম স্বার্থে নয়, দেশের মঙ্গলই লক্ষ্য ছিল ব'লেই কি রামমোহন মঙ্গল বারে পত্রিকাখানি প্রকাশ করতেন?

ধর্ম সম্বন্ধে, রাজনীতি সম্বন্ধে এবং সমাজ সম্বন্ধে নানারূপ রচনা "সম্বাদ-কৌমুদী" পত্রিকায় মুদ্রিত হত।

বাঙ্গালীর অর্থ ব্যয়ে বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত, এবং বাঙ্গালীর দ্বারা সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র কোন্‌খানি? বলা হয় যে, ঐ "সম্বাদ কৌমুদী" পত্রিকাখানি।

"মীরাৎ-উল্‌-আখবার" ঃ রামমোহন রায় ঐ "মীরাৎ-উল্‌-আখবার" পত্রিকাখানি প্রকাশ করতেন ফরাসী বা পার্শী ভাষায়। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার পত্রিকাখানি প্রকাশিত হ'ত। ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হত প্রধানত মুসলমান পাঠকদের জন্য। এই দেশের এবং অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধীয় নানারূপ রচনায় ঐ পত্রিকাখানি পূর্ণ থাকত। ঐ খানিই হয়তো কলিকাতা হ'তে পার্শী ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকাখানি পারস্য দেশেও চ'লে যেত। সেখানে সাগ্রহে পঠিত হ'ত।

"মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার" পত্রিকায় রামমোহন তাঁর সম্প্রাদকীয় রচনা মুদ্রিত করতেন। সেই সব রচনার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হ'ত "Calcutta Journal" পত্রিকায়। বাকিংহাম সাহেব ছিলেন "Calcutta Journal"—এর সম্পাদক?

অর্থ নৈতিক শোষণের বিরোধিতা ঃ ভারতে তৎকালে বিদেশী ইংরাজের শাসন অর্থ নৈতিক শোষণে পর্যবসিত হয়েছিল। ভারতের বহু অর্থ বিদেশীর স্বার্থে বিদেশে চলে যেত। সেই অর্থে ভারতের স্বার্থ লেশমাত্রও হ'ত না।

অর্থনীতি সম্বন্ধেও রামমোহনের প্রতিভা কম ছিল না। সেই জন্যই ভারতের ঐরূপ অহিত ভারত-ভানু রামমোহনের চিত্ত ব্যথিত ক'রে তুলেছিল।

ভারতের ঐরূপ অনিষ্টের প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে রামমোহন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, যে সকল বিদেশী লোক ভারতে কার্য করার পর ভারত ত্যাগ ক'রে চলে যান, তাঁরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ তো সঙ্গে নিয়ে গমন করেনই, অধিকন্তু তাঁরা তাঁদের দেশে ব'সেও প্রতি

বৎসরই এই দেশ হতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন। তাঁদের প্রাপ্ত সেই অর্থে ভারতের কিছুমাত্র উপকার হয় না। সুতরাং তাঁরা যদি এই দেশে বসবাস করেন, এই দেশ হতে লব্ধ অর্থ রাশি এই দেশেই ব্যয় করেন, তা হ'লে, এই দেশের টাকা এই দেশেই থাকে।

রামমোহনের ঐরূপ অভিমতকে বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষ ব'লে অভিহিত করা যায় না।

রামমোহন শোষণের বিরোধিতা করেছেন, তোষণের বিরোধিতা করেছেন, 'সত্যই সুপথ্য, এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন।'

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ঃ রামামোহন রায় তাঁর প্রতিভা-নেত্রে দেশের দশ রকম ক্ষেত্রেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের ইংরাজ রাজ প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছেন। তাঁরা বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা কায়েম করে প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব প্রাপ্ত হ'ন? অত অধিক রাজস্ব অন্য কোন সরকার কখনও প্রাপ্ত হন নি।

ভূস্বামীরা বা জমিদারেরা নানা উপায়ে দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেওয়ায়, সেই সব জিনিসপত্র নানা দেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানি করার শুল্ক হিসাবে ইংরাজ রাজ প্রচুর অর্থ লাভ করেন। এদেশের ইংরাজ রাজ বলতেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে তাঁরা মস্ত বড় একটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কিন্তু রামমোহন এরূপে প্রমাণিত করে দিয়েছিলেন, যে ইংরাজ সরকারের এ অভিমত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

কৃষককুলের কল্যানকল্পে ঃ কৃষককুলের সেবার ফলে ভূমি হয়ে ওঠে ভূ-মা। কৃষকের মঙ্গল লাঙ্গলের ফলায়, মানুষকে অন্ন যোগায়, বাঁচায়।

প্রাচীনকালে ভারতের অত্যুচ্চ শ্রেণীর লোকেরাও নিজ হস্তে কৃষি

কার্য সম্পাদন করতেন ; এখনও ভারতের কোন কোন ভূভাগে তাঁরা তা ক'রে থাকেন।

কৃষক মানব কুলতিলক, এ সত্য রামমোহনের হৃদয় ভূমিতে প্রস্ফুটিত ছিল।

তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধারগণকে পত্রযোগে এইরূপ জ্ঞাপন করেছিলেন : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দরিদ্র কৃষকদের দারিদ্র্য লেশমাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নি। কৃষকগণের দ্বারা প্রদেয় করের পরিমাণ ক্ষীণ ক'রে দেওয়া হ'লে, দীন কৃষকের জীবনে সুদিন দেখা দিতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লে সরকারের আয় যদি হ্রাস পায়, তাহ'লে তার প্রতিকার হচ্ছে এইরূপ : এই দেশের বিদেশী সরকারের বহু বিদেশী-কর্মী এই দেশে চাকরি ক'রে অত্যধিক বেতন প্রাপ্ত হন। তাঁদের চাকরি না দিয়ে, তাঁদের স্থলে এই দেশের লোককে কর্মীরূপে নিযুক্ত করা যেতে পারে। বিদেশী কর্মীদের বেতন কম হবে। তার ফলে, সরকারের বহু পরিমাণ অর্থ বেঁচে যাবে।

আরও একটি কার্য করা যেতে পারে। — বিলাসের উপকরণ রূপে যে সকল দ্রব্য লোকে ব্যবহার করে,—যে সকল দ্রব্য নিত্য-প্রয়োজনীয় একান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য নয়, সেই সকল জিনিসের জন্য শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেওয়া যেতে পারে। তার ফলে সরকারী আয় বৃদ্ধি পাবে।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় : এই দেশে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রামমোহনের অবদান নিশ্চয়ই মহান।

মুদ্রাযন্ত্রের অধিকার যাতে অধিক না হয়, স্বাধীনতা যাতে সংকুচিত হয়, ভারতের তখনকার শোষক বিদেশী ইংরাজ শাসক সেইটাই ইচ্ছা করতেন। তাঁদের সেই চেষ্টা চলছিল ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হতেই। লর্ড মিণ্টো এবং লর্ড ওয়েলেসলী ছিলেন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করার পক্ষপাতী। সে সময়ে সরকারী কর্মচারীরা সংবাদপত্রে প্রকাশের রচনাগুলি মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে দেখে দিতেন ;

সেগুলির পরিবর্তন ক'রে দিতেন বিদেশী সরকারের স্বার্থের অনুকূলে নিজেদের খুশিমতো।

দেশের স্বার্থের জন্য, সংবাদপত্র অবাধে স্বাধীনভাবে অভিমত প্রকাশ করবে, এই ছিল রামমোহনের সাধু অভিপ্রায়।

তখনকার Calcutta Journal নামক পত্রিকা ভারতের জন্য ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিল, এরূপ বলা যায়। কিন্তু এই দেশের তখনকার বিদেশী সরকার ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তখনকার অস্থায়ী ইংরাজ শাসনকর্তা জন অ্যাডাম্‌স্ এ পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিলেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক জেমস্ বাকিংহাম এবং সহকারী সম্পাদক স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণটকে ভারত ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য করা হ'ল।

উক্ত পত্রিকার সম্পাদকেরা কি করেছিলেন? এক খ্রীষ্টান পাদ্রী এই দেশের স্বার্থবিরোধী কার্য ক'রেছিলেন। Calcutta Journal পত্রিকার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক এ দুই ইংরাজ খ্রীষ্টান সেই কার্যের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন,—এই ছিল তাঁদের অপরাধ।

সরকারের অনুমতি গ্রহণ না ক'রে কেউ কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করতে পারবে না,—ইংরাজ শাসক জন অ্যাডামস্ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই আদেশ জারি করলেন।

রামমোহন তখন কি করলেন? তিনি ঐ অবৈধ বিধির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলেন। তখনকার সুপ্রীম কোর্টে আবেদনপত্র উপস্থাপিত করলেন। সেই আবেদন পত্রে হরচন্দ্র বসু, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বাক্ষর দান করেছিলেন। কিন্তু সেই ন্যায়সংগত আবেদন সেই সুপ্রীম কোর্টে ধর্মাধিকরণের ন্যায়বিচার প্রাপ্ত হয়নি। ইংলণ্ডের তখনকার রাজা ছিলেন চতুর্থ জর্জ। তাঁর নিকটও আবেদন পত্র প্রেরিত হ'ল প্রীভিকাউন্সিলে বিচারের জন্য। কিন্তু সুবিচার প্রার্থনা ক'রে, লাভ বিছার কামড়—আবেদন অগ্রাহ্য হ'ল।

রামমোহন তখন তাঁর "মীরাৎ-উল্-আখবার" পত্রিকাখানি প্রকাশ করা স্বেচ্ছাবশেই বন্ধ ক'রে দিলেন। ঐরূপে তিনি করলেন সেই অবৈধ বিধির প্রতিবাদ।

কয়েক বৎসর পরে, এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার আইন বলবৎ হয়েছিল ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে।

লর্ড মেটকাফ ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার যথেষ্ট পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সে বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগও প্রদর্শন করেছিলেন।

সেই ব্যাপারের মূলেও ছিলেন রামমোহন,—এটা সত্য ব'লে মনে করা যেতে পারে।

জুরীর বিচারের বেলায়ঃ জুরীর বিচার ব্যবস্থাটা অনেকেই সমর্থন করেন। এদেশে জুরী সম্বন্ধীয় আইন নূতন ক'রে বলবৎ হয় ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ আইনের ব্যবস্থা ছিলঃ এই দেশের খ্রীষ্টানগণ এবং বিদেশী ইউরোপীয়রাও এই দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মোকর্দ্দমায় জুরীরূপে কার্য করতে পারবেন। কিন্তু এই দেশের খ্রীষ্টানগণের মোকর্দ্দমায় এবং এই দেশস্থ বিদেশী ইউরোপীয়দের মোকর্দ্দমায় হিন্দুগণ এবং মুসলমানগণ জুরী বিচারকরূপে কার্য করবার অধিকারী হবেন না।—সে কী অপরিমেয় অন্যায় ব্যবস্থা। ন্যায় পথের পথিক রামমোহন এ অন্যায়ের বিরুদ্ধেও ন্যায়ের নিশান উড্ডীন করলেন। তিনি একখানি প্রতিবাদপত্র রচনা করলেন। বহু হিন্দু ও মুসলমান সেই প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর দান করলেন। রামমোহন তখন সেখানি প্রেরণ করলেন ইংলণ্ডের পারলামেণ্ট সভায়।

সেই সুমহান আর্য রামমোহন সর্বপ্রকার শুভ কার্যেই উদ্যোগী ছিলেন।

ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টায় রামমোহনঃ ভারতে ইংরাজ-শাসনের সেই প্রথম যুগে এ দেশের মানুষের পক্ষে বিদ্যার্জনের ব্যবস্থা মোটেই প্রশস্ত ছিল না। তখন ইংলণ্ডের কর্তারা স্থির করলেন

ভারতে ভারতীয় সেবাকার্যে—অর্থাৎ, শিক্ষাবিস্তারে—লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করা হবে। কিন্তু সংস্থাপন করা হবে শুধু সংস্কৃত শিক্ষার বিদ্যালয়। এ সময়ে "Public Instruction" নাম দিয়ে এক কমিটি গঠিত হ'ল।

বিচক্ষণ রামমোহন বিবেচনা করলেন, এই দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হওয়া প্রয়োজন। তিনি তখন লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট একখানি সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করলেন। সেই পত্রের সার কথা হল ঃ এদেশে গণিত, রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হ'লে, ভারতের মঙ্গল হবে। কেবল মাত্র সংস্কৃত শিক্ষায় ভারত সম্যকরূপে উপকৃত হতে পারে না। পাদ্রী হিবার সাহেব বলেছেন, ঐ পত্রখানি এক "আশ্চর্য বস্তু"।

ডেভিড হেয়ার ঃ হেয়ারৎ-কল্লিন-পামরশ্চ ক্যারী-মার্শম্যানস্তথা,
পঞ্চ গোরা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্।

—এই রসিকতার ছড়াটি এদেশে একদা সুপ্রচলিত ছিল। এ নাম কয়টি বিদেশীদের নাম। তাঁরা এদেশে নানা কর্মে রত ছিলেন।

এ ছড়ার মধ্যে হেয়ার অর্থাৎ ডেভিড হেয়ারের নাম সর্বাগ্রে দেখা যাচ্ছে। ডেভিড হেয়ার এ দেশকে দ্বেষ করেন নি। হেয়ারের হিয়ায় হিয়ায় ছিল এদেশের মঙ্গল-চিন্তা। ডেভিড হেয়ার ঘড়ির ব্যবসায় করতে এদেশে এসেছিলেন। পরে, ব্যবসা ত্যাগ ক'রে, এদেশে শিক্ষা বিস্তার কার্যে অধ্যবসায় প্রদর্শন করেন।

হিন্দু কলেজ ঃ একদা রামমোহনের অনুষ্ঠিত এক ধর্মসভায় ডেভিড হেয়ার রবাহূত হয়ে—বিনা নিমন্ত্রণে এসে উপস্থিত হন। তখন নানা কথাপ্রসঙ্গে, ডেভিড হেয়ার বলেন, ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। তা হ'লে, এ দেশের উন্নতিই সাধিত হবে।

সেই সময় হতে রামমোহন ও হেয়ার হলেন এক জনে অন্য জনের যথার্থ বন্ধু।

এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন কল্পে ডেভিড হেয়ারের প্রস্তাবটি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জ্ঞাপন করলেন সার হাইড ইষ্টকে। হাইড ইষ্ট তখন ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি। তিনি এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখে শ্রবণ করলেন ঐ প্রস্তাব।

সার হাইড ইষ্টের ভবনে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। কলিকাতার একটি মহাবিদ্যালয় বা কলেজ প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব সকলের সমর্থন লাভ করল। ঐ সম্বন্ধে গঠিত কমিটির সভ্যদের মধ্যে রামমোহন হলেন অন্যতম।

এ সংবাদটি যখন প্রচারিত হ'ল, তখন অনেকেই বললেন, এ কলেজের কমিটিতে রামমোহন রায় যদি থাকেন, তবে, তিনিই থাকুন, আমরা এ কলেজের কোন ব্যাপারেই থাকব না।

মানুষের পরম মিত্র রামমোহন শ্রবণ করলেন সেই অমিত্রোচিত বাক্য। তিনি ব'লে উঠলেন, "আমাকে যারা চায় না, আমি তাদের চাই। এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোক, এই আমি চাই। তাই আমি এ কমিটিতে থাকতে চাই না।"

রামমোহন এ কমিটির সদস্যরূপে রইলেন না। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর উদ্যম কিছুমাত্র শিথিল হল না।

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। সেই সভায় 'হিন্দু কলেজ' কমিটি গঠিত হ'ল। কমিটির সদস্য হলেন ভারতীয় বিশ জন, ইংরেজ দশ জন।

কে হলেন সেই কমিটির সম্পাদক? বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আর্ডিন সাহেব হলেন যুগ্ম সম্পাদক।

কলিকাতা শহরের গরাণহাটা নামক অঞ্চলে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সেইটির নাম 'হিন্দু কলেজ'।

শিক্ষা বিস্তারের সে এক শুভ দিন।

বঙ্গের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি হিন্দু কলেজেরই ছাত্র।

রামমোহন স্কুল-কলেজে ধর্মশিক্ষা দানেরও খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র-সম্বন্ধে একদা এক ভদ্রব্যক্তি রামমোহনকে বললেন, "দেওয়ানজী মশাই, হিন্দু কলেজের অমুক ছাত্রটি প্রথমে ছিল Polytheist। তারপর সে হ'ল Diest। বর্তমানে সেই ছাত্রটি হয়েছে Atheist।"

রামমোহন হাস্য সহকারে ব'লে উঠলেন, "তা হ'লে, শেষ পর্যন্ত, সে হয়তো হবে Beast।"

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের স্বার্থত্যাগ : ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য রামমোহন নিজ ব্যয়ে কলিকাতার হেদুয়া পল্লীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রায় ৮০টি হিন্দু ছাত্র সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাল্যকালে রামমোহনের সঙ্গে শকটে আরোহণ ক'রে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে গমন করতেন। তিনি ছিলেন রাম-মোহনের পুত্র রমাপ্রসাদের সহপাঠী।

ইউষ্টেস ফেরী ছিলেন পাদ্রী উইলিয়াম ফেরীর ভ্রাতার পুত্র। রামমোহন তাঁকে বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য জমি দান করেছিলেন।

ডফ সাহেবকে রামমোহন বিদ্যালয় স্থাপনের স্থান প্রদান করেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ-ভবনে। এ স্কুলের ছাত্রও রামমোহন জুটিয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়টিকে তিনি অর্থ সাহায্য দানও করতেন।

বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় : ইংরাজী শিক্ষা যতখানি প্রয়োজন, সংস্কৃত শিক্ষাও ততখানিই প্রয়োজন,—এইরূপ ছিল রামমোহনের অভিমত।

কলিকাতায় নিজ ভবনেই রামমোহন "বেদ-বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বেদ-বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিল কয়েকজন যুবক। অধ্যাপক ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত।

সংগীত রচনায় কবি রামমোহনঃ রামমোহন সংগীত রচনা করেছেন। তাই তিনি কবি।

তিনি তাঁর বিরচিত সংগীতগুলির মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচার ক'রেছেন; ইন্দ্রিয় সংযমের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেছেন, বিষয়াসক্ত হওয়ার অনিষ্টকারিতার বর্ণনাও করেছেন।

মানুষের ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রামমোহনের বিরচিত এই সংগীত মানুষকে করে পুলকিত ঃ

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়,
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়।
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এ ত ভাল নয়।

ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজমান। তিনি দশ দিকে বিরাজমান। তিনি নিকটে বিরাজমান। দূরে বিরাজমান। তিনি সব কিছুর এইরূপ ঃ

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা;
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী॥

গুণাতীত পরব্রহ্মের মহিমা বর্ণনে ব্রহ্মনিষ্ঠ রামমোহনের রচনা কতই উপাদেয় ঃ

সে কোথায় কার কর অন্বেষণ।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে
ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে,
ক্ষণে আন ক্ষণে তাঁরে
কর বিসর্জন।

কে বুঝিবে তাঁর মর্ম,
ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম,
গুণাতীত পরব্রহ্ম,
সকল কারণ।
জ্ঞানে যত্ন নাহি হয়,
পঞ্চে করি নিশ্চয়,
সে পঞ্চ প্রপঞ্চময়
না জান কি মন।

রামমোহনের রচিত গীতিগুলি যেন অমৃতের তুলী।

বাংলা গদ্যে গরীয়ান রামমোহন : কোন্ স্রষ্টা বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা ?

রাজা রামমোহন রায় মহোদয় কি বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা ?

ঐতিহাসিকেরা বলেন, "না, রামমোহন বাংলা গদ্য রচনার সৃষ্টি-কর্তা নন ; তিনি অন্যতম আদি পুষ্টিকর্তা। রামমোহস রায় কর্ত্তৃক বাংলা গদ্য রচনার পূর্বেও বাংলা গদ্য ছিল।"

বাংলা গদ্যের প্রথম নিদর্শন কোন্ গ্রন্থে দৃষ্ট হয় ? 'শূন্যপুরাণ' নামক পুস্তকে, প্রণেতার নাম রমাই পণ্ডিত।

শূন্য পুরাণ, হয় তো, খৃষ্টীয় একদশ শতকে বিরচিত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে এবং অষ্টাদশ শতকে বাংলা গদ্য রচনার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাঙ্গালা শিক্ষার্থীদের জন্যও বাংলা গদ্য গ্রন্থ বিরচিত হয়েছিল রামমোহনের পূর্বেই।

খৃষ্টীয় ১৮০০ অব্দ হতে ১৮১৫ অব্দের মধ্যে বিরচিত হয় নিম্নলিখিত বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থগুলি।

রামরাম বসুর বিরচিত "প্রতাপাদিত্য-চরিত" এবং 'লিপিমালা' পাদ্রী উইলিয়াম কেরী সাহেবের প্রণীত 'ইতিহাস মালা" এবং "কথোপকথন" ; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার বিরচিত "প্রবোধচন্দ্রিকা",

"হিতোপদেশ", "বত্রিশ সিংহাসন", চণ্ডীচরণ মুন্সী কর্তৃক প্রণীত "তোতার ইতিহাস", গোলকনাথ শর্মার রচিত "হিতোপদেশ", হরপ্রসাদ রায়ের রচিত "পুরুষ পরীক্ষা", রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত"।

এ পুস্তকগুলির মধ্যে কোন কোন পুস্তকের ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃত শব্দ-বহুল ; কোন কোন পুস্তকে রয়েছে রাশি রাশি পার্শী শব্দ।

তা হ'লে, রাজা রামমোহন রায় বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে কি মহান কার্য সম্পাদন করেছিলেন ?

রাজা রামমোহন রায় সেইরূপ বাংলা গদ্য প্রথম রচনা করেছিলেন, যেরূপ গদ্য রচনা সাধারণের পাঠের উপযোগী— রামমোহনের পূর্বে সাধারণের পাঠের উপযোগী বাংলা গদ্য তেমন কিছু ছিল না, বলা যায়।

পরম উপাদেয় উপনিষদ গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত। রামমোহন বাংলা কয়েকখানি উপনিষদের অনুবাদ করেন। তাঁর নানারূপ বাংলা গদ্য রচনা তর্কবিতর্ক এবং কথোপকথনচ্ছলে বিরচিত হয়।

রাজা রামমোহন ত্রিশখানির অধিক বাংলা পুস্তক রচনা করেন। কতিপয় পুস্তকের নাম এখানে প্রদত্ত হ'ল।—

"বেদান্ত গ্রন্থ", "বেদান্ত সার", "কঠোপনিষৎ", "তলবকার উপনিষৎ", "গোস্বামীর সহিত বিচার", "ভট্টাচার্যের সহিত বিচার" "কায়স্থের সহিত মদ্যপান-বিষয়ক বিচার", "ব্রাহ্মণ ও মিসনারি সম্বাদ", "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ" "বজ্রসূচী", "গায়ত্রীর অর্থ", "ব্রহ্মসঙ্গীত", "গৌড়ীয় ব্যাকরণ", "আত্মানাত্মবিবেক", "কুলার্ণব তন্ত্র—পঞ্চতম খণ্ড—প্রথম উল্লাস"।

প্রথম বাংলা ব্যাকরণ—"গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ" : বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে বিরচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ পুস্তকের নাম কি ?

প্রথম বাংলা ব্যাকরণ পুস্তকের নাম : "গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ", রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক বিরচিত।

বঙ্গভাষায় প্রথম ব্যাকরণকার রামমোহন রায় তাঁর বিরচিত "গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ" পুস্তকে কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি ছেদচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। বঙ্গভাষার রচনায় তিনিই ঐ সব ছেদ চিহ্ন প্রথম ব্যবহার করেন ব'লে বলা যায়। পূর্বে, বঙ্গভাষার রচনায় কেবল মাত্র একটি দাঁড়ি এবং দুইটি দাঁড়ি ব্যবহৃত হ'ত। রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্য আদিত্যবৎ।

ইয়োরোপে রামমোহন ঃ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃগৃহ-চ্যুত অখ্যাত-অজ্ঞাত দুঃসাহসী রামমোহন রায় পদব্রজে তিব্বত গমন ক'রেছিলেন।

বার্ধক্য অবস্থায় উপনীত বিখ্যাত বিরাট ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর ভারত হতে জাহাজযোগে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। সেই জাহাজখানির নাম Albion, বাংলা অক্ষরে, অ্যাল্‌বিয়ন্‌। ইংরাজী কবিতায় কোন ক্ষেত্রে ব্রিটেন বা ইংলণ্ড শব্দ প্রয়োগ ক'রে অ্যাল্‌বিয়ন্‌ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যাকে বলে ব্রিটেন, তাকেই বলে অ্যাল্‌বিয়ন্‌।

রামমোহনের ইংলণ্ড গমনের কারণ ঃ রাজা রামমোহন রায় কেন ইংলণ্ডে গমন করলেন ?

রাজা রামমোহনের ইংলণ্ড গমনের কারণ এইরূপ ঃ তখনকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট আবুনসর মৈনুদ্দীন আকবর বা দ্বিতীয় আকবরকে কোন কোন বিষয়ের অধিকার হতে বঞ্চিত করেছিলেন। সেই সম্বন্ধে প্রতিকারকরণ। উক্ত কোম্পানী কর্তৃক ভারতের শাসন-প্রণালী নির্ধারণ করার ব্যাপারে ভারতের অভিমত ইংলণ্ডে জ্ঞাপন। সতীদাহ নিবারণে আইনের সমর্থনে আবেদন জ্ঞাপন।

দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আকবর এ সময়ে রামমোহমকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। তিনিই রামমোহনকে তাঁর দূতরূপে ইংলণ্ডে

প্রেরণ করেন। ভারতের তখনকার ইংরাজ বড়লাট রামমোহনের 'রাজা' উপাধি এবং দৌত্য স্বীকার করেন নি।

ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়াম রামমোহনের 'রাজা' উপাধি স্বীকার ক'রেছিলেন। রাজা কর্তৃক রাজ ভোজে আপ্যায়িত হয়েছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রামমোহনের 'রাজা' উপাধি স্বীকার করেনি। রামমোহনকে দিল্লীর সম্রাটের দূত বলেও স্বীকার করেনি। কিন্তু ঐ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রাজা রামমোহনকে ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। সেই ভোজে রামমোহন ভারতীয়দের মতো খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। মদ স্পর্শ করেন নি।

বাঙ্গালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় প্রথম ইংলণ্ডে গমন করেন, এরূপ বলা হয়েছে।

রামমোহনের সঙ্গে গমন করেছিলেন তাঁর পালিত পুত্র রাজারাম, রামমোহনের সেবক রামহরি দাস এবং রামরতন মুখোপাধ্যায়। একটি দুগ্ধবতী গাভীও রামমোহন সঙ্গে নিয়েছিলেন। জাহাজে রামমোহন এবং তাঁর তিনটি সঙ্গী ভারতীয় খাদ্য গ্রহণ করতেন।

রামমোহনের সঙ্গীরা সমুদ্র পীড়ায় আক্রান্ত হন। রামমোহন সমুদ্র পীড়ায় আক্রান্ত হন নি। জাহাজে তিনি সংস্কৃত ও হিব্রু ভাষায় গ্রন্থ অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকতেন।

'অ্যাল্‌বিয়ন' জাহাজ যখন ভারত মহাসাগরের মধ্যে চলমান তখন ঝঞ্ঝা হ'ল প্রবহমান। জাহাজের যাত্রীরা হলেন ত্রাসবশে কম্পমান। কিন্তু ধীমান রাজা রামমোহন তখনও অভীরূপে শোভমান।

ইংলণ্ডে রাজা রামমোহনঃ 'অ্যাল্‌বিয়ন্‌' ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল 'অ্যাল্‌বিয়ন' স্পর্শ করল। ইংলণ্ডের লিভারপুল শহরে উপস্থিত হ'ল। সময় লেগেছিল চার মাস তেইশ দিন।

রামমোহনের ইংলণ্ড গমনের পূর্বে, রামমোহনের যশ ইংলণ্ডে গমন করেছিল। রামমোহন লিভারপুলে উপস্থিত হ'লে, তথাকার প্রধান ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, করমর্দন করলেন।

রামমোহন ও উইলিয়াম রস্কো : ইংরাজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম রস্কো তখন লিভারপুলে অবস্থান করতেন। তখন তাঁর বয়ঃক্রম প্রায় ৯০ বৎসর। তিনি তাঁর রচিত পুস্তক উপহাররূপে পূর্বেই রামমোহনকে প্রেরণ করেছিলেন।

রস্কোর পুত্র আগমন করলেন রামমোহনের নিকট ? রামমোহনকে নিয়ে গেলেন তাঁদের ভবনে। রামমোহন রস্কোকে ভারতীয় প্রথায় অভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। দুই বিরাট ব্যক্তির মধ্যে নানারূপ আলোচনা হ'ল।

রামমোহন যাতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে প্রবেশ লাভ করে, সেই মহাসভার অধিবেশন দর্শন করতে পারেন, সেইজন্য রস্কো লর্ড ব্রুহাম-এর নামে রামমোহনের হস্তে একখানি লিপি প্রদান করলেন।

ম্যাঞ্চেস্টারে রামমোহন : কিছুদিন পরে, রামমোহন লণ্ডনে যাত্রা করলেন। লণ্ডন ইংলণ্ডের রাজধানী। লণ্ডন যাত্রা পথে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে অবতরণ করলেন। সেখানকার নানারূপ কলকারখানা দর্শন করলেন।

তথাকার হাজার হাজার শ্রমিক এবং অন্যান্য নর-নারী রাজা রামমোহনকে দর্শন করতে এলেন। সুবিপুল জনতার মধ্যে শান্তি রক্ষা করার জন্য বহু সংখ্যক পুলিশ প্রস্তুত রইলেন।

রামমোহন অনেকের সহিতই করমর্দন করলেন। তারপর ভারত সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় ভাষণ দিলেন। ভাষণ শ্রবণে, শ্রোতৃবৃন্দ স্মিত ও বিস্মিত হলেন।

লণ্ডনে রামমোহন : রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে উপনীত হলেন রাত্রিকালে। সেই রাত্রিকালে তিনি যেন ভারতের দীপ নিয়ে ইংলণ্ড-দ্বীপের রাজধানীতে উপস্থিত হলেন।

নিউগেট স্ট্রিটে একটি হোটেলে বা পান্থশালায় প্রবেশ করলেন রামমোহন। কিন্তু দেখলেন, সেই পান্থশালা পুতিগন্ধময়। রামমোহন

তখনই সেই পান্থশালা পরিত্যাগ করলেন। গমন করলেন অ্যাডেলফি হোটেলে। রাত্রি তখন দশ ঘটিকার কম নয়।

গভীর রাত্রে রামমোহন দর্শনে দার্শনিক : দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম তখন বৃদ্ধ। তথাপি দার্শনিক তত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন। স্ব-ভবনের বহির্দেশে আগমন বড় করতেন না। কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎও করতেন না। তিনি শ্রবণ করলেন, রামমোহন রায় লণ্ডনে আগমন করেছেন, পান্থশালায় অবস্থান করছেন।

সেই গভীর রাত্রেই রামমোহন দর্শনে পান্থনিবাসে আগমন করলেন জেরেমি বেন্থাম। কিন্তু রামমোহন তখন সুপ্তিমগ্ন।

সুপ্তির ব্যাঘাত সৃষ্টি করা তিনি সংগত মনে করলেন না। এক খণ্ড কাগজে লিখলেন : "Jeremy Benthum to his friend Rammohan Roy"। কাগজখানি রেখে গেলেন।

পরে উভয়ের সাক্ষাৎকার হয়েছিল।

"শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ" : কিছুদিন পরে, রাজা রামমোহন অ্যাডেলফি পান্থশালা ত্যাগ করলেন। অবস্থান করলেন গিয়ে ১২৫ নং রিজেণ্ট স্ট্রিটে। তিনি "ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ" ব'লে অভিহিত হতে লাগলেন।

রিজেণ্টস্ট্রিটস্থ ভবনে বহু নর-নারী আগমন করতে লাগলেন রামমোহন দর্শনে। বেলা ১১ ঘটিকা হতে ৪ ঘটিকা পর্যন্ত হতে লাগল "শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ" দর্শনার্থী জনগণের সমাগম। তাঁরা ভারত সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলেন। অভিরাম রামমোহন প্রদান করলেন সেই সবের উত্তম উত্তর!

লণ্ডনে অভ্যাগত রামমোহনের অভ্যর্থনা : তখনকার পরাধীন ভারতের ইংরাজ রাজের দেশে রামমোহন বিরাজ করতে লাগলেন রাজবৎ।

যে ভারতে অতিথিকে গণ্য করা হয় দেববৎ, সেই ভারতের

রামমোহনকে প্রথম প্রকাশ্য অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করল ব্রিটিশ ইয়ুনিটেরিয়ান সমিতি।

ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের সিংহাসন আরোহণ উৎসবে ইয়োরোপের নানা রাষ্ট্রের রাজা এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দ যখন সভাস্থলে উপবিষ্ট, সকলে তখন দর্শন করল, ভারতের রামমোহন রায় তাঁদের মধ্যে বিরাজমান।

ইংলণ্ডের রাজার ভ্রাতা সাসেক্স্ এর ডিউক রামমোহনকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি একদিন রামমোহনকে ভোজদানে আপ্যায়িত করলেন।

ডেভনসায়ার-এর ডিউকও রামমোহনকে সমাদর করতেন; থিয়েটারে নিয়ে যেতেন; ভোজ দানে আনন্দলাভ করতেন।

ইংলণ্ডের রাজ-ভ্রাতা কাম্বারল্যাণ্ড-এর ডিউক রামমোহনের সঙ্গ লাভে ছিলেন খুবই উৎসুক।

শিক্ষামন্ত্রী লর্ড ব্রুহাম রামমোহনের সঙ্গে সখ্য সংস্থাপন করেছিলেন।

লণ্ডন শহরের সেতুর উদ্‌বোধন কালে এক বিরাট ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডের রাজার আমন্ত্রণ ক্রমে রাজা রামমোহন সেই ভোজে যোগদান করেন।

এশীয় বিষয়ের গবেষণাকেন্দ্র রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটীর বার্ষিক সভায় যোগদানের জন্য রামমোহন রায় আমন্ত্রণ লাভ করেন। সেখানে রামমোহনের সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যাবিবুধ শ্রীকোলব্রুক সাহেব নানা বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেই আলোচনা যেন হয়েছিল আলো রচনা।

রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করার জন্য একদা এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় একজন ইংরাজ বক্তা বলেন, অদ্য যদি "প্যারাডাইস লস্ট" কাব্য প্রণেতা মহাকবি জন মিল্‌টন, কিংবা দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ ফ্রান্সিস বেকন এই সভায় সমাসীন থাকতেন, তা হ'লে ইংরাজগণ যেরূপ আনন্দোৎফুল্ল

হতেন, ভারতের রামমোহন দর্শনেও তাঁরা তদ্রূপ আনন্দ লাভ করছেন।

সভা ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে, সভাপতি ব'লে উঠলেন, আমরা এখন সকলে দণ্ডায়মান হয়ে ভারতের ভাতিবাহী রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব।

সভাস্থ সকলেই তখনই দণ্ডায়মান হলেন। রামমোহন বিনয়-নম্র হলেন।

রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তাঁর একজন ইংরাজ বন্ধুর নিকট ইংরাজী ভাষায় লিখিত পত্রে খুব সংক্ষেপে আত্মচরিত লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

ভারতের কৃষককুলের সখা : ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রীয় মহাসভা প্রয়োজন ব'লে বোধ করেছিল। সেই অনুসারে সেই মহাসভা একটি সাব-কমিটি গঠন করে। রাজা রামমোহনের নিকট হতে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানানো হয়। রামমোহনকে নানা বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। বিবিধ বিষয়ের মধ্যে, বঙ্গদেশের এবং মাদ্রাজের কৃষককুলের অবস্থা সম্বন্ধে রামমোহনের মন্তব্য ছিল এইরূপ : বঙ্গদেশের এবং মাদ্রাজের কৃষককুলের দুর্দশা অতিশয় অধিক। তাঁরা বাধ্য হয়েই জমিদারগণের কৃপার উপর নির্ভর করেন।

কৃষককুলের ঐ দুর্দশার প্রতিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বলেন, তাঁদের প্রদেয় করের পরিমাণ যদি বর্ধিত করা না হয়, তা হ'লে তাঁদের দুর্দশার কিঞ্চিৎ লাঘব হতে পারে।

ধর্মাধিকরণে ইংরাজ বিচারকদের সঙ্গে ভারতীয় বিচারকও থাকা একান্তই উচিত; সিভিল সার্ভিসে অল্পবয়স্ক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উচিত নয়,—ইত্যাদিরূপ নানা বিষয় সম্বন্ধে রামমোহন ভারতের কল্যাণের জন্য একটি লিখিত প্রস্তাবও উপস্থাপিত করেছিলেন।

দিল্লীর বাদশাহকে যে বৃত্তি প্রদান করা হ'ত, তার পরিমাণ ছিল বারো লক্ষ টাকা। কিন্তু রামমোহনের চেষ্টার ফলে, ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানী বাদশাহকে প্রদত্ত বৃত্তির পরিমাণ বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বর্ধিত ক'রে দিতে সম্মত হয়েছিল।

সতীদাহ নিবারণ আইন সমর্থন: সতীদাহ নিবারণ আইন রহিত করার জন্য কলিকাতার বহু বিশিষ্ট হিন্দু ইংলণ্ডনস্থ প্রীভিকাউন্সিলের নিকট এক আবেদন করেন। সেই অবৈধ আবেদন যাতে গ্রাহ্য না হয়, সেই উদ্দেশ্যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন রামমোহন ইংলণ্ডের রাষ্ট্রিয় মহাসভার নিকট এক আবেদনপত্র উপস্থাপিত করেন। সেই বিষয়ের বিচারকালে রামমোহনকে বিচারকদের পার্শ্বেই আসন প্রদান করা হয়।

বিচারকদের বিচারে সতীদাহ নিবারণ আইনই বলবৎ রইল; ঐ আইন রহিত করার আবেদন হ'ল অগ্রাহ্য।

ফ্রান্সে রামমোহন: রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ইংলণ্ড হ'তে ফ্রান্স বা ফরাসী দেশে যাত্রা করেন।

তৎকালে ফরাসী দেশের সম্রাট ছিলেন লুই ফিলিপ। তিনি তাঁর রাজপ্রাসাদে রাজা রামমোহন রায়কে অভ্যর্থনা করেন; রামমোহনের সঙ্গে একত্রে আহার করেন। ভারত সম্বন্ধে নানা বিষয় রামমোহনের নিকট হ'তে অবগত হন। সেই ভোজে রামমোহন কেবলমাত্র ফলমূল আহার করেছিলেন।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস। সেখানে কবি টমাস মুর-এর সঙ্গে কৃষ্টি-কলা ইত্যাদি নানা বিষয় সম্বন্ধে রামমোহনের আলোচনা হয়। তাঁরা একসঙ্গে আহারও করেন।

ফ্রান্সের একজন ধর্মযাজক রামমোহনের ভূয়সী প্রশংসা ক'রে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন।

ফ্রান্সের একখানি বিখ্যাত পুস্তকেও রামমোহনের ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছিল রামমোহনের ফরাসীদেশে গমনের কয়েক বৎসর পূর্বে।

কিছুকাল রামমোহন ফরাসী ভাষা শিক্ষাতেও মনোযোগী ছিলেন।

প্যারিসস্থ এশিয়াটিক সোসাইটী রাজা রামমোহনকে সভাপদ প্রদান করে গুণীজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল।

ফ্রান্স হতে রামমোহন লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে।

ব্রিষ্টল নগরে ঃ বিপুল দৈহিকশক্তিশালী রামমোহনের শরীর আর সুস্থ থাকা সম্ভব ছিল না। সেই সঙ্গে উপস্থিত হল অর্থাভাব। রামমোহন ভারতে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক হ'লেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট কিছু অর্থ ঋণরূপে প্রাপ্ত হতে চাইলেন। কিন্তু চাওয়াই সার হল, পাওয়া আর গেল না।

রামমোহন লণ্ডন ত্যাগ করলেন। এলেন ব্রিস্টল নগরে। নগরের এক প্রান্তে অবস্থান করলেন একখানি মনোরম গৃহে; সেই ভবনের নাম স্টেপল্‌টন গ্রোভ।

স্টেপল্‌টন গ্রোভের কর্ত্রী ছিলেন কুমারী ক্যাসল। তিনি রামমোহনকে খুবই সমাদর করতেন।

কুমারী কিডল, ডক্টর কার্পেণ্টার এবং আরও দু'চারজন ঐখানে রামমোহনের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শ প্রাপ্ত হতেন।

সুসাহিত্যিক জন ফস্টারও প্রায়ই রামমোহনের নিকট আগমন করতেন। উভয়ের আলোচনায় আলোকে পুলকে সেই ভবন যেন হয়ে উঠত এক কৃষ্টিকানন।

ব্রিস্টলে ছিল শ্রীকার্পেণ্টারের ইউনিটেরীয় ভজনালয়। রামমোহন সেখানে গমন করতেন। গমনের পূর্বে ধর্ম সংগীত পাঠ করতেন, আবৃত্তি করতেন। সেই ধর্ম সংগীতের রচয়িতার নাম হচ্ছে ওয়াট। ঐখানেই কুমারী কার্পেণ্টার রামমোহনের দর্শন লাভ করেন। ঐ কুমারী হয়েছিলেন স্বদেশসেবিকা এবং তা হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দীপনা প্রভাবে।

নানা বিষয় সম্বন্ধে রামমোহনের অভিমত অবগত হওয়ার জন্য ব্রিস্টলে এক বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রামমোহনকে নানা বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। রামমোহন সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। বৃদ্ধ রামমোহন তখন তিনঘণ্টাকাল যাবৎ দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করেন।

রোগের আক্রমণ : ঐ সভার পরবর্তী দিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর। রাজা রামমোহন রায় জ্বর রোগের আক্রমণে অভিভূত হলেন। ডক্টর কার্পেন্টার এবং অন্যান্য বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করতে লাগলেন। পরিচর্যা করতে লাগলেন ডেভিড হেয়ারের ভগিনী কুমারী হেয়ার এবং কুমারী ক্যাসল, কুমারী কার্পেন্টার, কুমারী কিডল।

তৎকালে একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর নাম প্রীচার্ড। তিনি সযত্নে রামমোহনের রোগ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

ঐদিন রামমোহন সামান্য সুস্থবোধ করেন। তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পরবর্তী দিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, রামমোহনের, রোগ আবার প্রবল হয়ে উঠল। মাথায় হল সুতীব্র যন্ত্রণা। কোন কোন ব্যাধির আক্রমণ ব্যাহত করতে জীবন্ত জলৌকা বা জোঁক অসামান্য পটুতা প্রদর্শন করে থাকে। রামমোহনের মাথায়ও জলৌকা প্রযুক্ত করা হল। রাত্রিকালে দেখা গেল রোগীর অবস্থা একটু ভালো।

এল ২৬শে সেপ্টেম্বর। রাত্রি ১১টা বেজে গেল। ঐ সময় দেখা গেল, রামমোহন ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর কোন কোন অঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। বদন বিকৃত হতে লাগল। সে অবস্থা অতি দুরবস্থা।

পরলোক পথে যাত্রা : এইবার ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩ খৃস্টাব্দ। রাজার রোগ প্রবল। জীবন ক্রমশই হয়ে পড়েছে ক্ষীণবল, হীন বল।

রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকা। চারিদিকে চন্দ্রালোক। অমৃতপথ-যাত্রী রামমোহন রায়ের পার্শ্বে তখন রয়েছেন রামহরি ও রাজারাম; রয়েছেন ডাক্তার কার্পেন্টারের মমতাময়ী মাতা; রয়েছেন কুমারী কিডল, কুমারী হেয়ার, কুমারী ক্যাসল।

কুমারী হেয়ার রোদন করছিলেন।

সেই রাত্রি হ'ল রাজা রামমোহন রায়ের অপার্থিব পার্থিব জীবনের শেষ রাত্রি। রামমোহন হলেন অমৃতপথযাত্রী।

রাত্রি দুই ঘটিকার পর রামমোহন প্রাপ্ত হলেন লোকান্তর!

মরণ যেন রামমোহনকে বরণ করল।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও রামমোহন 'ওঁকা'র ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন।

পরবর্তী দিন, রামমোহনের শবের নিকট এলেন এক শিল্পী—এক ভাস্কর। তিনি তৈরী করলেন রামামোহনের প্রতিমূর্তি।

এখানে আর একটি কথা।

ভারতের রামমোহন মৃত্যু মুখে পতিত হলেও, ইংলণ্ডের রামমোহন ইংলণ্ডে অবস্থান করতে লাগলেন।

ইংলণ্ডের রামমোহন কে?

লণ্ডনস্থ এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম ছিল ডেভিডসন। রামমোহনকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর পুত্রকে 'রামমোহন' নাম প্রদান করেছিলেন।

অন্ত্যেষ্টি : রাজা রামমোহন রায় সারাজীবনই মানুষের অনিষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইষ্টবিধান করেছেন। এইবার তাঁর অন্ত্যেষ্টি।

কুমারী ক্যাসল রুগ্ন রামমোহনকে সেবাদান করেছিলেন। তিনিই দিলেন রামমোহনের সমাধি স্থান তাঁরই ভবন-প্রান্তে।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর। সমাধি প্রাপ্ত হলেন রামমোহন নরপ্রবর।

সমাধি মন্দির : রামমোহনের মহা প্রয়াণের কয়েক বৎসর পরে

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকনাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে গমন করলেন। দর্শন করলেন রামমোহনের সমাধিস্থান। তিনি তাঁর পরমবন্ধু রামমোহনের শবটি সমাধিস্থান হতে গ্রহণ করলেন। সেটি নীত হল 'আর্নোস ভেল্' নামক সমাধিক্ষেত্রে। সেখানে সমাহিত করানো হল। দ্বারকানাথ সেখানে একটি সমাধি মন্দির নির্মাণ করালেন।

যা কিছু মহান, আর যা কিছু মোহন,
তাই দিয়ে বিকশিত শ্রীরামমোহন

রামমোহন-সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা পৌরুষ : রামমোহনের নশ্বর জীবন এখন আর নেই। কিন্তু স্বদেশ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি এখনও জীবন্ত!—আলোকস্তম্ভ!

তাঁর জীবনের আখ্যায়িকাগুলি এখনও অক্ষয়, এখনও অমৃতময়!

সতীদাহপ্রথা রহিতকরণ-বিধি বিঘোষিত হওয়ার কিঞ্চিৎকাল পূর্বের একটি ঘটনা।

ভারতের ইংরাজ শাসক লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে রামমোহন সঙ্গে আলোচনা করতে চান। তিনি রামমোহনকে আহ্বান জানালেন লাটভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য।

বড়লাটের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী রামমোহনের ভবনে এলেন। বললেন, বড়লাট বাহাদুরের সঙ্গে আপনি সাক্ষাৎ করুন, এই তাঁর ইচ্ছা।

সাক্ষাতের আহ্বান জানিয়েছেন বড়লাট,—ঐ বাক্য শ্রবণে, যেন কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হ'ল রামমোহনের ললাট।

রামমোহন গম্ভীর কণ্ঠে এইরূপ কিছু ব'লে উঠলেন, কিন্তু আমার তো তা ইচ্ছে নয়।—আমি এখন বিষয় কার্যের সঙ্গে লিপ্ত নই। আমি বর্তমানে ধর্মবিষয় নিয়ে ব্যাপৃত।

বড়লাটের দূত চ'লে গেলেন। রামমোহনের বাক্য অবিকল ভাবে বড়লাটকে জানালেন।

ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক পূর্বেই শ্রবণ করেছিলেন, ভারতে রাম ছিলেন তিন জন : রাবণ দমন রাম, হলায়ুধ বলরাম এবং পরশুরাম। এখন তাঁর প্রেরিত দূতের মুখে রামমোহনের বাক্য শ্রবণ ক'রে, বেন্টিঙ্ক ভাবলেন, ভারতে রাম ছিলেন তিন জন, এ কথা শুনেছি। এইবার দেখছি, ভারতে চতুর্থ রামও রয়েছেন।

বেন্টিঙ্ক তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই কর্মচারীকে বললেন, "আপনি এখনই পুনরায় রামমোহন রায়ের নিকট গমন করুন। তাঁকে বলুন, উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, তিনি খুবই আনন্দিত হবেন।"

দূত পুনরায় গমন করলেন রামমোহন রায়ের সমীপে। অবিকল ভাবে বললেন বড়লাটের বাক্যরাশি। রামমোহন বডলাটের অনুরোধ রক্ষা করলেন।

বিদেশী বড়লাট সেদিন পরাধীনদেশের একটি স্বাধীন মানুষকে দর্শন করেছিলেন।

জন্মগ্রহণে অনন্যসাধারণতা : রামমোহন মানুষকে ধর্ম-অন্ন এবং আরও নানাবিধ অন্ন পরিবেশন করেছেন।

মুখের অন্নগ্রহণে তাঁর সামর্থ্য কিরূপ ছিল ?

কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে কাহিনী শোনা যায়—রামমোহন নাকি প্রত্যহ দ্বাদশ সের পরিমাণ দুগ্ধ পান করতেন। একটি পাঁঠার মাংস ভোজনে তাঁর নাকি কোন ক্লেশ হত না! চল্লিশ পঞ্চাশটি আম্র ফল দ্বারা নাকি হত সেই বিপ্রপ্রবরের জলযোগ। সেই সঙ্গে কয়েক সের দুগ্ধও যে না খেতে পারতেন তা নয়।

একবার রামমোহন গমন করেন হুগলীতে এক ভদ্রলোকের ভবনে। তিনি দেখলেন, নারিকেল গাছে রয়েছে বেশ কয়েকটি নারিকেল। রামমোহন নারিকেল খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

সেই ভদ্রলোক তখনই গাছ থেকে একটি নারিকেল পাড়ালেন। জল ও শাঁস রামমোহনের সম্মুখে প্রদান করলেন।

রামমোহন ব'লে উঠলেন, "গাছে নারিকেল রয়েছে অনেকটি—আপনি আমাকে দিলেন মাত্র একটি।"

ভদ্রলোকটি বেশ একটু বিস্মিত হলেন। তখন গাছ থেকে বেশ কয়েকটি নারিকেল নামান হল।

তারপর সেই কয়টিই শ্রীরামের সেবায় লেগে গেল।

ঘটনাটি আমাদের আস্ত হাস্ত পূর্ণ না করুক, পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই দেশে যদি টিকে থাকতে চায় তা হ'লে, ঐরূপ স্বাস্থ্যই তার চাই। ঐ ঘটনাটি পেটুকতার কাহিনী নয়, প্রয়োজনীয় পুষ্টির কাহিনী।

রামমোহন যেমন ছিলেন মানসিক শক্তিশালী, তেমনই ছিলেন দৈহিক শক্তিশালী। তিনি অতি দ্রুতবেগে পদক্ষেপ করে চলতে পারতেন। তাঁর মস্তক ছিল সুবৃহৎ। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়। সেই দীর্ঘকায় পুরুষ এই দেশের অনেক খর্বতাকে ক'রে গেছেন খর্ব।—সেইটাই আমাদের গর্ব!

রামমোহন প্রত্যহ স্নানরত হওয়ার পূর্বে তাঁর সমস্ত দেহে প্রচুর সরিষার তৈল মর্দন করতেন। মর্দনের পরও দেখা যেত, অনুপম রাম-তনু হতে তৈল যেন বারিধারার মতো পতিত হচ্ছে।

প্রকাণ্ড একটা টব জলরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। তিনি সংস্কৃত, আরবী এবং পার্শী কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ঝম্প প্রদান পূর্বক সেই জল মধ্যে পতিত হতেন। সেই টবের জলের মধ্যে অবস্থান করতেন এক ঘণ্টা অপেক্ষাও অধিককাল। তখনও করতেন সেই সব কবিতা আবৃত্তি।

রামমোহনের চেহারা ছিল অতি সুন্দর। তাঁর হৃদয়ও ছিল ততোধিক সুন্দর।

বুদ্ধির জোর বড় জোর: অনেক লোকেরই বন্ধু থাকে—কথাকথিত বন্ধু। সেই বন্ধু বলে, "আমি তোমার বন্ধু। যা কিছু আমার, সেই সব কিছুই তোমার।" কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায়,

সেই তথাকথিত বন্ধু, শেষ পর্যন্ত, হয়ে ওঠে বন্দুক—ইষ্টকে পিষ্ট করে অনিষ্ট করে।

কলিকাতার নিকটস্থ টাকির জমিদার কালীনাথ মুন্সী মহাশয়ও ছিলেন রামমোহনের বন্ধু। বিপদে-আপদে সাহায্যপ্রদ বন্ধু।

একদিন একটি লোক এল সেই মুন্সী মহাশয়ের নিকট। লোকটির হাতে একটি শঙ্খ। শঙ্খটি সে বিক্রয় করতে চায়। লোকটি বলল, "এই শঙ্খ মানুষকে করে নিঃশঙ্ক। এই শঙ্খ যার ঘরে থাকবে, ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী তার গৃহে থাকবেন। অর্থের অভাব কোন কালেই হবে না।"

কালীনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "শঙ্খটির মূল্য কত ?"

উত্তর শ্রবণ করলেন, "পাঁচ শত টাকা।"

কালীনাথ মুন্সী ভাবলেন, এই শঙ্খ পাঁচ শত টাকা মূল্যে ক্রয় করার পূর্বে রামমোহন রায়ের অভিমত গ্রহণ করি না কেন ?

কালীনাথ সেই শঙ্খের সেই মালিকসহ গমন করলেন রাম-মোহনের নিকট।

রামমোহন সমস্ত বিষয়টা অবগত হয়ে, একটি মোহন হাস্য সহকারে ব'লে উঠলেন, "পাঁচ শত টাকা মূল্যের একটা শঙ্খ ঘরে থাকলে, লক্ষ্মীও ঘরে থাকবেন ? ত'হলে, ঐ ব্যক্তিই শঙ্খটি নিজের ঘরে রাখছেন না কেন ?"

এইবার কালীনাথ মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন !

বুদ্ধিমান বন্ধু রামমোহনের পরামর্শে, কালীনাথ একটা প্রবঞ্চনার প্যাঁচ থেকে বেঁচে গেলেন।

শ্রমিক-প্রেমিক

কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চল সদাই কর্মচঞ্চল। একদিন রাম-মোহন চ'লেছেন সেখানকার বড় রাস্তা দিয়ে। দেখলেন, একজন শ্রমিক তাঁর প্রকাণ্ড একটা মোট মাথায় তুলে নিতে পারছে না।

রাস্তা দিয়ে অনেক লোক যাচ্ছে। তারা শ্রমিকটির দিকে

তাকাচ্ছে। কিন্তু মোট মাথায় তুলে দেওয়ার ইচ্ছা তাদের মোটেই হচ্ছে না।

রামমোহনের তখন স্মরণ পথে সমুদিত হ'ল হিন্দুশাস্ত্রের হিতকথা —ভারবাহীকে পথ ছেড়ে দেবে—অগ্রে গমন করতে দেবে।

ঐ শাস্ত্রবাক্যের অর্থ হচ্ছে—শ্রমিকজনের হিতকর কর্ম সর্বাগ্রে সম্পাদন করবে।

রামমোহন সেই শ্রমিকটির সম্মুখস্থ হলেন। মোটটা উত্তোলন করলেন। শ্রমিকটির প্রয়োজন সিদ্ধ হ'ল। তাঁর হৃদয় স্নিগ্ধ হ'ল।

সেই শ্রমিক রামমোহনকে দিলেন তাঁর শ্রমের পারিশ্রমিক—কৃতজ্ঞতায় ভরা একটি মিষ্টি দৃষ্টি।

রামমোহন কৃষক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে খুবই মেলামেশা করতেন। তাঁদের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করতেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের মতো ক'রে বাক্যালাপ করতেন, সখ্যালাপ করতেন।

রসিকতা : রামমোহনের ভবনে ছিল একটি হিন্দোল—দোলনা। শিশুরা সেই দোলনায় আরোহণ ক'রে দোল খেত। রামমোহনও তাদের সঙ্গে শিশুবৎ যোগদান করতেন।

একদিন রামমোহন দোলনায় দোল খাচ্ছেন। এক পণ্ডিত ব্যক্তি তখন আগমন করলেন সেই স্থানে। রামমোহনকে ঐ অবস্থায় দর্শনে সেই পণ্ডিত মহাশয় হাস্যাননে ব'লে উঠলেন, "এ কি! কি করছেন?"

সুরসিক রামমোহন ব'লে উঠলেন, 'সমুদ্রপথে জাহাজে আরোহন ক'রে একবার বিলেত যাব ব'লে ভাবছি। সমুদ্রতরঙ্গে জাহাজ খুব দোলে। তার ফলে, যাত্রীদের নাকি পীড়া হয়। কিন্তু পূর্ব হতেই দোল খাওয়ার অভ্যাস থাকলে, দিনের পর দিন সমুদ্র-তরঙ্গের দোল খেলেও, পীড়া হয়তো আর পীড়ন করতে পারবে না। তাই এইরূপে দোলনায় দোল খাই।'

মমতা ও মোকদ্দমা : রামমোহনের একজন কর্মচারীর নাম ছিল জগন্নাথ। রামমোহনের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম ছিল যাদবচন্দ্র রায়।

যাদবচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা মোকদ্দমা হচ্ছিল। রামমোহনের কর্মচারী জগন্নাথ সেই মোকদ্দমার একটা আপিল করলেন সুপ্রীম কোর্টে। কোর্টে যে দিন মোকদ্দমা হ'ত, রামমোহন সে দিন কোর্টে গমন করতেন। তিনি তখন যাদবচন্দ্রকে ষোড়শটি মুদ্রা অর্থাৎ টাকা প্রদান করতেন। কেবল তাই নয়। তিনি তাঁর সেই পরম স্নেহাস্পদ যাদবচন্দ্রের মুখখানি মুছিয়ে দিতেন।

সেই মোকদ্দমায় কোন্ পক্ষ জয়লাভ করল? জয়লাভ করলেন যাদবচন্দ্র। তার ফলে, যাদবচন্দ্র যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হলেন, রামমোহন তদপেক্ষা কিছু কম আনন্দ প্রাপ্ত হলেন না।

রামমোহন বললেন, কিছুটা জমি গেল, মোকদ্দমায় অর্থ গেল, যাক! ছেলের যে হ'ল জয় সেই পরমানন্দের বিষয়!

মনোবলে কবি : রামমোহনকে তাঁর মনোবল সম্বন্ধে একবার একটা পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

রামমোহনের নিকট কত লোকই তো যেতেন। নীলমণি কেরানী এবং ভবানী চরণ দত্তও যেতেন। ঐ দুই ভদ্রব্যক্তি এক দিন স্থির করলেন, তাঁরা রামমোহনের মনোবল পরীক্ষা করবেন।

রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদ তখন রামমোহনের নিকট ছিলেন না। তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগরে। নীলমণি এবং ভবানীচরণ রামমোহনের নামে একখানি পত্র লিখলেন। সেই পত্র যেন কৃষ্ণনগরস্থ কোন ব্যক্তির লেখা, এইরূপ ভাবে পত্রখানি লেখা হ'ল। পত্রে বর্ণিত বার্তাটা হল : রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদ মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন।

সেই যুগে ডাকহরকরা নানা স্থানে গমন ক'রে পত্রাদি প্রাপককে প্রদান করত। ভবানীচরণ এবং নীলমণি একটি লোককে ডাকহরকরার ছদ্মবেশ ধারণ করালেন। বললেন তাকে, ভাই তুমি রামমোহনের নিকট যাও, এই পত্র তাঁর হস্তে দাও, তার পর আমাদের নিকট হতে কিছু পুরস্কার নাও।"

ডাকহরকরা কোন সময়ে রামমোহনের নিকট গমন করবে সে কথাও তাকে ব'লে দেওয়া হ'ল।

তারপর, ভবানীচরণ ও নীলমণি চ'লে গেলেন রামমোহন ভবনে। উপবেশন করলেন রামমোহন সন্নিধানে।

কিয়ৎকাল পরে, সেই হরকরা এল। সেই পত্র প্রদান করল ব্রহ্মবাদী রামমোহনের হস্তে।

পুত্রের মৃত্যুর বার্তাবাহী সেই পত্র রামমোহন পাঠ করলেন।

তখন কিরূপ হ'ল তাঁর অবস্থা ?

উজ্জ্বল আনন মলিন হ'ল। তবুও তখনও তিনি অস্থির নন, স্থির।

সময় চ'লে যেতে লাগল। কতক্ষণ সময় চ'লে গেল ? হয়তো পাঁচ মিনিটও না।

তখন ভবানী ও নীলমণি দর্শন করলেন, রামমোহনের পদ্মোপম আনন আবার পূর্ববৎ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হল।

নীলমণি ও ভবানী তখন নিজেদের ছলনার কথা রামমোহনের নিকট প্রকাশ করলেন।

মৃত্যুই হয় তো সর্ব শোকাধিক। কিন্তু সেই শোককে জয় করতেও পাঁচমিনিট সময়ও রামমোহনের প্রয়োজন হয় নি।

হিন্দুশাস্ত্র বলে, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ শোক অতিক্রম করেন —শোকাতিভূত হন না। রামমোহন ছিলেন আত্মবিৎ বা আত্মজ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ।

রাজা রামমোহনের একটি পালিত-পুত্র ছিল। তার নাম রাজারাম। রাজারাম ছিল অত্যন্ত চঞ্চল। সে রামমোহনের প্রতিও অনেক সময় প্রবল চাঞ্চল্য প্রকাশ করত! কিন্তু তৎসত্ত্বেও, সেই চপল রাজারাম রামমোহনকে চঞ্চল বা অস্থির ক'রে তুলতে পারত না। রামমোহন রাজারামের সর্ববিধ চাঞ্চল্য অবিচল ভাবে সহ্য করতেন।

রামমোহন ছিলেন অতিশয় মিষ্টভাষী, অতিশয় বিনয়ী ও নম্র।

দয়াদৃষ্টি ঃ সাধারণত দেখা যায়, যে স্থানে বাজার বসে, সেই স্থানের কর্তারা দ্রব্যাদির বিক্রেতাদের নিকট হতে 'তোলা' গ্রহণ করেন। রামমোহনের একটি পুত্র তাঁদের গ্রামের বাজারে সেইরূপ 'তোলা' গ্রহণ করতেন।

রামমোহন ঐ ব্যাপার বহুদিন যাবৎই অবগত ছিলেন না। যে দিন অবগত হলেন, সেদিন রামমোহন ব'লে উঠলেন, "আমার পুত্র বাজারের অতি দরিদ্র ব্যবসায়ীদের নিকট হতে 'তোলা' গ্রহণ করছে। তা হলে, তার হৃদয় কত দরিদ্র!"

রমেমোহনের পুত্র শ্রবণ করলেন তাঁর পিতার খেদোক্তি। তাঁর দ্বারা বাজারে 'তোলা' তোলা আর হয়নি কোন দিন।

দরিদ্র ব্যবসায়ীরা বাঁচলেন। আনন্দ উচ্ছ্বাসে মনে মনে হয় তো নাচলেন।

রামমোহন রায়ের পিতা ছিলেন জমিদার। রামমোহনও ছিলেন জমিদার। কিন্তু রামমোহনের জমিদারী প্রজাদের পক্ষে যম হয়ে ওঠেনি। রামমোহন পাতক ছিলেন না, ছিলেন প্রেমিক।

সমদৃষ্টি ঃ রামমোহনের ভবনে সেই যুগের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিই আগমন করতেন। একবার আগমণ করলেন বর্ধমানের মহারাজা বাহাদুর। তার পরক্ষণেই এসে উপস্থিত হলেন একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক।

রামমোহন এ দুই জনের মধ্যে কাকে কিরূপে অভ্যর্থনা করলেন?

অভ্যর্থনা করলেন সমভাবে। উভয়কে প্রদান করলেন সমান আসন।

গীতায় বলা হয়েছে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা সমদর্শী হন।

ক্ষমায় মহান ঃ রামমোহন নানারূপ মহান ও মোহন কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। তথাপি, সেই সৎ মানুষটির শত্রু ছিল শত শত।

একবার এক ব্যক্তি, রামমোহনের প্রতি অকারণে বিদ্বেষ বশে, রামমোহনের বিরুদ্ধে এক সংগীত বানিয়ে ফেলল। সেই সংগীতের ইঙ্গিত মোটেই শ্লীল ছিল না।

রামমোহনের ভাগিনেয়র নাম ছিল গুরুদাস মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস রামমোহনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন। তিনি অবগত হলেন সেই অশ্লীলতার ইঙ্গিতময় সংগীতের কথা।

গুরুদাস তখন অস্থির হলেন। স্থির করলেন, সেই অধম সংগীত-ওয়ালাকে কিছু উত্তম-মধ্যম দেবেন।

অবিলম্বেই রামমোহন অবগত হলেন তাঁর ভক্ত ভাগিনেয়র সেই অভিপ্রায়।

রামমোহন তখন আহ্বান করলেন গুরুদাসকে। গুরুদাস এলেন তাঁর মাতুল মহাশয়ের সন্নিধানে।

রামমোহন বললেন, "ওহে গুরুদাস, পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থে দেখা যায়, বারাণসী রাজের সারথি বারাণসী রাজের বর্ণনা ক'রে বলে-ছিলেন, বারাণসীরাজ এই রূপ ঃ

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনম্।

—আক্রোশ দ্বারা ক্রোধী ব্যক্তিকে জয় করেন; সাধুতা দ্বারা অসাধু ব্যক্তিকে জয় করেন, কদর্য ব্যক্তিকে দান দ্বারা জয় করেন; অলীকবাদী ব্যক্তিকে সত্যদ্বারা জয় করেন।"

সেই উপদেশ শ্রবণান্তে গুরুদাসের হৃদয়দেশ শান্ত হ'ল। সেই সংগীতওয়ালাকে কোন শাস্তি পেতে হ'ল না।

সে স্বস্তিলাভ করল কি?

সর্বভূত হিতে রত ঃ সূর্য-চন্দ্রের কিরণরাশি নিতান্ত অধম মানুষের গৃহের মধ্যেও প্রবেশ করে। রামমোহনের প্রীতিও ইতর জীবের প্রতিও ছিল।

একদিন রামমোহনের একজন পাচক একটা পাঁঠাকে পীড়ন

সহকারে বধ করছিল। সেই মাংস ভোজনের জন্য রান্না করা হবে।

রামমোহন যখন গৃহে ছিলেন না, তখন ঐরূপ নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যে রামমোহন এসে পড়লেন। তিনি দর্শন করলেন ঐ পশু পীড়ন দৃশ্য। তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন, আমি মাংসাহার করি বটে কিন্তু পীড়ন ক'রে পশুবধ করলে, সেটা কি নিতান্ত একটা বদ কাজ করা হয় না?"

রামমোহন পাচককে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলেন—পাঁচ টাকা জরিমানা করলেন।

পাচক বুঝল, তার মনিব আমিষাশী বটে, কিন্তু তাঁর হৃদয় কাহাকেও পীড়াদান প্রবৃত্তিরূপ পীড়াগ্রস্থ নয়।

"কে আমায় মারবে"ঃ রামমোহনের মিত্রও ছিল অনেক, অমিত্রও ছিল অনেক।

একদিন এক ভদ্রলোক রামমোহনকে বললেন, "আপনি করছেন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার। পৌত্তলিকতার পক্ষপাতীরা স্থির করেছেন, আপনাকে দেবে আচ্ছা রকম প্রহার।"

রামমোহন হাস্য করলেন "কে আমাকে মারবে? কারা আমাকে মারবে?—আমাকে যারা প্রহার করবে, তাদের হাড় বেশ শক্ত ত'? তারা কি খায়? কি পরিমাণে খায়।"

অপ্রতিম পিতাঃ সেই দিন, যে দিন রামমোহন এদেশ হতে ইংলণ্ড যাত্রা করছেন।

বর্তমান যুগে যানবাহন ও গমনা-গমনের কতই সুযোগ-সুবিধা। সেই যুগে সেরূপ ছিল না।

রামমোহন সুদূর ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেছেন। কবে পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করবেন, কিংবা প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হবে কিনা কিছু স্থির নেই।

তাই রামমোহন তনয় তখন অস্থির; ক্রন্দন করছেন।

অপ্রতিম পিতা রামমোহন স্থির কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ওরে পুরুষ বাচ্চা, ক্রন্দন কেন ?"

অশ্রুপাতের ফলে.
জীবন যায় জলে !

অপ্রতিম রামমোহন ঐ তত্ত্ব অবগত ছিলেন।

বিচক্ষণতা ঃ রাজা রামমোহন রায় তাঁর জীবনে এবং আচার-আচরণে খাঁটী হিন্দু ছিলেন। তাঁর স্কন্ধে উপবীত ছিল।

রামমোহনের ভবন-সন্নিকটে ছিল একটি উদ্যান, পুষ্প পুঞ্জে শোভমান। এক ব্রাহ্মণের দেব পূজার জন্য পুষ্প চাই। তাই তিনি প্রত্যহ প্রভাতে সেই উদ্যানে পুষ্প চয়ন করতেন।

একদিন, পুষ্প চয়নের পূর্বে, সেই ব্রাহ্মণ তাঁর গললগ্ন ওড়নাখানি পুষ্প তরু শাখায় ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর পুষ্প আহরণ করতে লাগলেন। একটু কাল পরে রামমোহনের একজন ভৃত্য, সেই চাদরখানি পুষ্পতরু শাখা থেকে তুলে নিয়ে অন্যত্র রেখে দিল।

পুষ্প সংগ্রহ সমাপ্ত হওয়ার পর, সেই ব্রাহ্মণ তাঁর চাদর অন্বেষণ করতে লাগলেন।

রামমোহন তাঁকে আহ্বান ক'রে প্রশ্ন করলেন, "কি অন্বেষণ করছেন।"

"আমার ওড়নাখানি।"

রামমোহন বললে, "উড়ানি উড়ে যায় নি ! পাবেন।"

রামমোহন সেই বিপ্রের সঙ্গে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

কিয়ৎ কাল পরে, রামমোহন ভৃত্যকে বললেন উড়ানিখানি এনে দিতে।

ব্রাহ্মণ তাঁর উড়ানিখানি প্রাপ্ত হলেন।

রামমোহন বললেন, "প্রিয়বর, উড়ানি পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন তো ?"

ব্রাহ্মণ ব'লে উঠলেন "আমার জিনিস আমি পেলাম।—এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ?"

সর্বক্ষেত্রে বিচার-বিজয়ী রামমোহন এইবার ব'লে উঠলেন, "এই যে পুষ্প রাশি আপনি চয়ন করেছেন, এ পুষ্প কার, দ্বিজবর ?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করলেন, "এই পুষ্প পরমেশ্বরের।"

রামমোহন ব'লে উঠলেন, "তা হ'লে, এই বার বলুন দেখি, আপনি আপনার উত্তরীয় পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায় আপনার যদি সন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ না থাকে, তা হ'লে আপনি দেবতার পুষ্প দ্বারা দেবতার পূজা সম্পাদন করলে, দেবতা কেন আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন ?"

ব্রাহ্মণ তখন রামমোহনের প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতে লাগলেন, উত্তর, দক্ষিণ ইত্যাদি দিকে দিকে।

সেই উত্তর অন্বেষণ এখনও চলেছে কি।

রাজা রামমোহন রায়ের দৈনন্দিন জীবন : রামমোহনের জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত করা হ'ল। রাজা রামমোহন রায় প্রতিদিন রাত্রি চারটার সময় নিদ্রাত্যাগ করতেন। তার পর কফি খেতেন। অতঃপর প্রাতঃভ্রমণে বহির্গত হতেন। তখন কয়েকজন লোক তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সাধারণত, সূর্যোদয়ের পূর্বেই গৃহে ফিরে আসতেন।

তগন গোলক দাস মহাশয় সংবাদপত্র পাঠ করতেন, রামমোহন শ্রবণ করতেন। তার পরে, রামমোহন চা পান করতেন, ব্যায়াম করতেন।

তাঁর স্নানের পূর্বে দুইজন শক্তিশালী ব্যক্তি তাঁর সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করতেন। ঐ সময়ে রামমোহন কি করতেন? তিনি আবৃত্তি করতেন ব্যোপদেব বিরচিত "মুগ্ধ বোধ ব্যাকরণ" গ্রন্থের সূত্ররাশি।

রামমোহন, ভূমির উপর উপবিষ্ট হয়ে' ভারতীয় প্রণালীতে ভাত-ডাল-তরকারি-মৎস-দুগ্ধ প্রভৃতি আহার্যদ্রব্য গ্রহণ করতন। ঐ সময়ে একটি লোক সংবাদপত্র পাঠ ক'রে রামমোহনকে শোনাতেন।

ভোজনান্তে রামমোহন ঘণ্টা খানেক কাল বিশ্রাম গ্রহণ করতেন

একটা টেবিলের উপর অবস্থান ক'রে। অপরাহ্ণ বেলায় ফল মূল ভক্ষণ করতেন। সন্ধ্যায় ভ্রমণ কবতেন।

তাঁর সায়াহ্ন ভোজনের সামগ্রী রন্ধন করা হত মুসলমানদের রন্ধন-প্রণালী অনুসারে।

রাজা রামমোহন রায়ের মস্তক সম্বন্ধে মস্তিষ্ক তত্ত্ববিৎ বা ব্রেন-লজিষ্ট-এর অভিমত এইরূপ :

The Raja's large head was of extraodinary size, the head of very few men in Europe being found of superior volume.

রাজা রামমোহনের রায়ের বাংলা গদ্য রচনার নিদর্শন

১ : বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্তশাস্ত্রে বিবরণের দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল, যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য স্বরূপ পরব্রহ্ম হইয়াছিল।………প্রায়শ আমাদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এ সকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত্ত করিয়ে সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি চিত্ত-নিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাঁহাদের প্রসন্নতার উদ্দেশে এই যত্ন করলাম।……

(২) আঠার শত একুশের চোদ্দঞি জুলাইয়ের সমাচার দর্পনকে কোন প্রধান ব্যক্তি বিবেচনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন তাহাতে দেখিলাম যে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রকে যুক্তিহীন জানাইয়া খণ্ডন কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি যাঁহার শাস্ত্র বিশেষ অবগতি নাই করিয়াছেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব। মীসিনরি মহাশয়রা এরূপ খণ্ডনের চেষ্টা সদালাপে গ্রন্থ রচনায় করিতেন সংপ্রতি সমাচার লিপিতেও আরম্ভ হইল কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিরুদ্ধ বোধ করিলাম নাই যেহেতু তেঁহ খণ্ডনের উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন অতএব পশ্চাতে লিখিত উত্তর দিতেছি।

(৩) (প্রথম বাংলা ব্যাকরণ "গৌড়ীয়ভাষা ব্যাকরণ" হ'তে নিম্নোক্তটুকু প্রদত্ত) সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম হয়, যে অনেকে পর পর সাপেক্ষ লইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিমতে নানা প্রকার শব্দ জানিতে পারে; এ নিমিত্তে এক ২ অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক ২ বিশেষ শব্দকে দেশ-ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন।......

সমাপ্ত